গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ২ - ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

অবস্থান মঞ্চ থেকে বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান

নীরব থাকার দিন শেষ, মানবতার পক্ষে দাঁড়ান

উর্বর কৃষিজমি জবরদখল ও কৃষক হত্যার বিরুদ্ধে এবং শিল্পহীন জেলাগুলিতে ও অকৃষি জমিতে শিল্পস্থাপনের দাবিতে ২৪ জানুয়ারি রাজ্যের প্রথম সারির অধ্যাপক, কবি, চিকিৎসক, শিল্পী, বিজ্ঞানী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের এক অবস্থান থেকে কৃষিজমি দখলে রাজ্য সরকারের মানবতাবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। বিশিষ্ট কবি ও অধ্যাপক তরুণ সান্যালের সভাপতিত্বে বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে বেলা ১২টা থেকে সারাদিন অবস্থান করেন।

কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের এই প্রতিবাদ মানবতা ও মানবাধিকার রক্ষায় সমাজের অগ্রণী অংশের গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করায়। অবস্থানের সূচনায় সভার সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে জার্মানিতে হিটলারের উত্থানপর্বে জার্মান বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ক্রিয়তার ভয়ঙ্কর পরিণাম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন — ফ্যাসিস্টরা যখন হাইনরিশ হাইনের বই পুড়িয়েছিল তখন বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ক্রিয়তা শেষ পর্যন্ত জার্মান জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ইতিহাসের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকে গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তিনি বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান করেন। তিনি বলেন, এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নানা কারণে যে নিষ্ক্রিয়তা কাজ করছিল, আজ তা ভাঙছে। সকলেই চাইছেন মানবতার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ ব্যক্ত করার জন্য একটা স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক। আমরা সে দিকেই পদক্ষেপ করব।

মঞ্চে একে একে আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীবৃন্দ। বয়সের ভার ও শারীরিক বাধা উপেক্ষা করে এসেছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অশীতিপর অধ্যাপক কান্তীশ মাইতি, শিক্ষক তপন রায়চৌধুরী, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, শাঁওলি মিত্র, অর্পিতা ঘোষ, সাংবাদিক-গায়ক কবীর সুমন, চলচ্চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, অধ্যাপক সৌমিত্র বসু, অধ্যাপক মেহের ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক ডাক্তার অসীম রায়চৌধুরী, ডাক্তার কিষান প্রধান, অধ্যাপিকা চৈতালি দত্ত, প্রযুক্তিবিদ চির দত্ত, সুজয় বসু প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন — আমাদের 'উন্নয়নবিরোধী' তকমা লাগিয়ে 'গণশত্রু' বানিয়ে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে শাসকদলের গোয়েবলসীয় প্রচারযন্ত্র। জর্জ বুশের মতো এরাও বলে, 'যারা আমাদের সঙ্গে নেই তারাই আমাদের শত্রু'।

তিনি বলেন — নীচের দিকটা নরক করে

পাঁচের পাতায় দেখুন

মঞ্চে (বাঁদিক থেকে) অর্পিতা ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী, কবীর সুমন, তপন রায়চৌধুরী, তরুণ সান্যাল, পবিত্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ঘটক

রাজ্যে পতিত জমি চাহিদার চেয়ে বহুগুণ বেশি

টাটা গোষ্ঠীর দাবি নতশিরে মেনে নিয়ে, শিল্পায়নের ধোঁকা দিয়ে কৃষিজমি দখল করে টাটা-সালিমদের হাতে তুলে দিতে গিয়ে প্রবল জনপ্রতিরোধের সামনে পড়ে মিথ্যার ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন সিপিএম নেতারা। মিথ্যা ভাষণের শিরোমণি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলছেন, এ রাজ্যে পতিত জমি মাত্র এক শতাংশ। দলের কর্মী ও বামপন্থী জনগণকে ঠকাতে তিনি ভাব দেখাচ্ছেন, যেন পতিত জমি নেই বলে বাধ্য হয়ে তিনি উর্বর কৃষিজমিতে হাত দিচ্ছেন। বলাবাহুল্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে ডাহা মিথ্যা প্রচার তিনি এমনি এমনি করছেন না। একচেটিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে বুদ্ধদেববাবু নিকৃষ্ট বুর্জোয়া নেতাদের স্তরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর নিজের সরকারের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী পুরোপুরি পতিত জমি হ'ল মোট জমির ৪ শতাংশ।

সিপিএম নেতারা একটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। তা হল শিল্পের জন্য পতিত জমি না নিয়ে শহরের কাছে উর্বর জমি তাঁরা নিচ্ছেন কেন? প্রশ্ন উঠছে, চাষের জন্য যে কোন জমি হলে চলে না, কিন্তু ঊষর জমিতেও শিল্প হতে পারে। কাজেই যদি 'সত্যিই' শিল্পায়নে তাদের মতি হয়ে থাকে তবে তো পতিত জমি নিলেই পারেন!

দুয়ের পাতায় দেখুন

বন্ধ কারখানার শ্রমিক আত্মঘাতী হচ্ছে, সিপিএম শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছে

বহরমপুরের জনসভায় কমরেড মানিক মুখার্জী

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-বারুইপুর-হলদিয়া সহ রাজ্যের সর্বত্র কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে এবং নন্দীগ্রামে সিপিএম-এর গণহত্যার প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি শনিবার পাঁচ সহস্রাধিক মানুষ, কর্মী-সমর্থক-দরদী-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব-সাধারণ পথচারী মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে থাকেন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জীর সময়োচিত যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য। এদিনের সভার প্রধান বক্তা হিসাবে কমরেড মুখার্জী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিশ্বায়নের নীতি কার্যকরী করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশের চেয়ে এক পা এগিয়ে। 'বাজার সমাজতন্ত্রে'র নামে যে দেঙ শিয়াও পিং চক্র সমাজতান্ত্রিক চীনকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত করে দেশি-বিদেশি পুঁজির শোষণ-লুণ্ঠনের স্বর্গে পরিণত করেছে, তাদের চালু করা 'স্পেশাল ইকনমিক জোন'এর মডেল পশ্চিমবঙ্গে চালু করতে সিপিএম বদ্ধপরিকর। আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক মুখে বিরোধিতা করলেও মন্ত্রীত্বের চাকরি ছাড়তে পারছে না। বামফ্রন্ট শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, উন্নয়নের বুলি আওড়াচ্ছে। অথচ ছাপ্পান্ন হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে। প্রাণ চলে যাচ্ছে। এদের চোখের জলের হিসাব কে রাখে? আপনারা সাধারণ মানুষ নিশ্চয় এ খবর রাখবেন। সমবেত জনতার উদ্দেশে কমরেড মুখার্জী বলেন, জমি রক্ষার লড়াইটা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে হবে না। কংগ্রেস-

পাঁচের পাতায় দেখুন

জমিরক্ষার আন্দোলনের সমর্থনে অবস্থান মুর্শিদাবাদেও

১২ জানুয়ারি বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে প্রায় দু-হাজার কৃষক, খেতমজুর, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী সহ বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ জমায়েত হন সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণকে সংহতি জানানোর উদ্দেশ্যে। সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন এবং সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে এদিন বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অবস্থান চলে। সিঙ্গুরে নিহত রাজকুমার ভুল ও তাপসী মালিক সহ নন্দীগ্রামে সিপিএম-এর ক্রিমিনাল বাহিনীর গুলিতে নিহত সপ্ত শহীদ স্মরণে নির্মিত বেদীতে মাল্যার্পণ করা হয়। সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বামপন্থী গণআন্দোলনের প্রবীণ শিল্পী নন্টু সাহার সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। সৌমেন দাস ও অমিতাভ মণ্ডলের সঙ্গীতে রক্তে ভেজা সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের সংগ্রামকে স্বাগত জানানো হয়। কান্দীর প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা বাদল দাস ও গোকুল হাজরার কবি সম্প্রদায় জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে কবিগান পরিবেশন করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলার বিশিষ্ট নেতা মদন সরকার, প্রবীণ বামপন্থী আন্দোলনের নেতা শিবু সান্যাল, একদা সিপিএম কৃষকসভার সাথে যুক্ত শিক্ষক আন্দোলনের নেতা হরিলাল দাস, ফরওয়ার্ড ব্লকের জঙ্গীপুর মহকুমার একদা সংগঠক গৌতম রুদ্র, বর্ষীয়ান বিশিষ্ট আইনজীবী কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, আইনজীবী মৃণালকান্তি ব্যানার্জী, শিবরতন চক্রবর্তী, সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তপন দাস প্রমুখ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ।

এদিন মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের ঘরে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শঙ্কর ঘোষ বলেন, বিশ্বায়ন ও ডব্লুটিও চুক্তিতে অঙ্গীকারবদ্ধ সমস্ত সংসদীয় দলগুলোর সাথে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকারও সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম কুলপি, কাটোয়া থেকে চীন সীমান্তের খুব কাছে উত্তরবঙ্গের ফুলবাড়ি পর্যন্ত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে সাধারণ কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। এসইজেড ভুক্ত এলাকাগুলোয় শ্রম আইনের কোন ধারা কার্যকর হবে না। ইচ্ছামতো শর্তে চুক্তি এবং যখন তখন ছাঁটাই করা যাবে। যতক্ষণ খুশি খাটিয়ে নেওয়া যাবে। এতদঅঞ্চলে ছোটবড় দেশীয় সমস্ত শিল্প উঠে যাবে। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য আসছে। সিপিএম এখানে নায়েবের ভূমিকা নিয়েছে। বিরোধী সংসদীয় দলগুলো আন্দোলন-আন্দোলন খেলা খেলছে। তিনি সভায় জানান, আমরা জমি অধিগ্রহণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে লাগাতার ও সংগঠিতভাবে শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব। সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির কার্যকরী সদস্য তপন দাস বলেন, সিঙ্গুরে মাত্র দেড়শো বিঘে জমি একফসলি, বাকি প্রায় দু'হাজার আটশো বিঘে দুই, তিন এবং চার ফসলি। এখানে প্রতি বিঘেতে একশো মণ চন্দ্রমুখী আলু উৎপাদিত হয়। আলুর মরশুমে স্থানীয় কৃষিশ্রমিক ছাড়াও বর্ধমান, মেদিনীপুর থেকে প্রায় তিন হাজার মানুষ কাজে আসে। সকলেই বেকার হয়ে যাবে। সিঙ্গুরের শিশুরাও এখন ঘরে ঘরে টাটার বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছে। আইনি লড়াই জটিলতা সৃষ্টি করে আমাদের সংগ্রামকে বিলম্বিত করবে। অস্ত্রধারী পুলিশের বিরুদ্ধে, হুলিগান বাহিনীর বিরুদ্ধে, নিরস্ত্র জনতার লড়াইয়ে সারা রাজ্য জুড়ে সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষের ঐক্য এবং সংহতি আজ একান্ত প্রয়োজন। এদিনের সভায় জেলার কৃষকনেতা মদন সরকার বলেন, লক্ষ লক্ষ চাষীকে জমিচ্যুত করে হাতে গোনা কয়েকজন মালিককে সিপিএম জমি দিয়ে দেবে। কিন্তু সিপিএম চিরকাল ক্ষমতায় থাকবে না। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কে হটাবে? শিবু সান্যাল বলেন, মানুষ ৩০ বছর অপেক্ষা করছিল, আজ লড়াইয়ের রাস্তা এবং হাতিয়ার পেয়ে গেছে। গৌতম রুদ্র বলেন, বামফ্রন্টের শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক করতাম। সিপিএম স্লোগান দিত, পুঁজিবাদ নিপাত যাক, টাটা বিড়লা নিপাত যাক। এখন টাটারা সমাজসেবী হয়ে গেল! নিজের বিবেক যন্ত্রণায় এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রবীণ শিক্ষক নেতা হরিলাল দাস বলেন, বুদ্ধদেববাবু ঔদ্ধত্যের সুরে বলেন, আমরা ২৩৫; অথচ পঞ্চাশভাগেরও বেশি মানুষ ওদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। বিনয় কোঙারের প্ররোচনায় জলপাই রঙের পোষাকপরা মোটর সাইকেল বাহিনী যদি গুলি চালিয়ে দেয়, তাহলে সেটা কেমন গণতন্ত্র? আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী বলেন, শিল্প আকাশে হবে না ঠিকই, কৃষিও আকাশে হবে না। শিল্প অনুর্বর জমিতে হবে, কিন্তু কৃষি অনুর্বর জমিতে হবে না। সর্বশেষে বর্ষীয়ান আইনজীবী কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত বলেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে ওরা যে অত্যাচার করেছে, ওদের মুখে সাদ্দামের পক্ষে সওয়াল করা শোভা পায় না। ওরা ধনী লোকেদের মদ খাওয়া আর নাচ করার জন্য মাল্টিপ্লেক্স তৈরি করছে, এটা আমাদের কৃষ্টি নয়। আমাদের ভাবতে হবে হাসেম সেখ, রামা কৈবর্ত্যদের জন্য। এদিন সভা সঞ্চালন করেন সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক সাজেম আলি।

নামখানায় সিপিএম নেতার মদতে পুড়িয়ে দেওয়া হল এস ইউ সি আই সমর্থকের বাড়ি ও ধানের গাদা

গত ১২ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানায় দ্বারিকনগর গ্রামে স্থানীয় এস ইউ সি আই সমর্থক কমরেড কঙ্কণ দাসের বাড়ি ও ধানের গাদা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল সিপিএম নেতা গুরুপদ পালের মদতে। বছর কয়েক আগে ঐ গ্রামে সিপিএম দল ত্যাগ করে বেশ কিছু পরিবার কঙ্কণ দাসের নেতৃত্বে এস ইউ সি আই দলে যোগ দেন। তখন থেকেই তাঁদের ওপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল, মেরে ফেলারও ষড়যন্ত্র চলছিল। এবার গুরুপদ পাল এক জমির মালিক রথীন দিণ্ডার পক্ষে চাষীদের বিরুদ্ধে দালালি করতে থাকায় সিপিএম সমর্থক চাষীরাও ঐ নেতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের নানা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন ঐ চাষীরা কমরেড কঙ্কণ দাসের সঙ্গে পরামর্শ করে মামলা লড়বার প্রস্তুতি নেয়। তাতে ঐ সিপিএম নেতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এরই পরিণতিতে কমরেড কঙ্কণ দাসের বাড়ি ও ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন ১৩ ডিসেম্বর থানায় ডায়েরি করা হয়। তখন সিপিএম নেতা নতুন ছক কষেন। তিনি কমরেড কঙ্কণ দাসের পুত্রবধূকে প্ররোচনা দিয়ে থানায় এনে পাল্টা ডায়েরি করান যে, কমরেড কঙ্কণ দাস ও তাঁর স্ত্রী ঐ পুত্রবধূকে নাকি পুড়িয়ে মারার জন্যই নিজেরা ঘরে আগুন লাগিয়েছেন। পুলিশ আগের ডায়েরির অনুযায়ী অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করলেও পরের ডায়েরি অনুযায়ী কমরেড কঙ্কণ দাসকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ওপর জামিন অযোগ্য অনেকগুলি ধারা চাপিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় এবং সিপিএম নেতৃত্বের এহেন আচরণে সাধারণ মানুষ তো বটেই, সিপিএম সমর্থকরাও বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড বাবুলাল হেমব্রম গত ২১ ডিসেম্বর পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। হুড়া থানায় পার্টির কাজকর্ম শুরুর সময়েই তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং পার্টির কাজকর্ম শুরু করেন। বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। শাসকদলের পক্ষ থেকে তাঁর উপর বহু অত্যাচার হয়েছে, এমনকী হত্যা করার চেষ্টাও হয়েছে। তাঁর জমিজমা, পুকুর নিয়েও তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা এবং এস ইউ সি আই দলের কাজকর্ম থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এস ইউ সি আই দলের আবেদনকারী সদস্য হিসাবে ছিলেন। কমরেড বাবুলাল হেমব্রমের মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল। গত ৭ জানুয়ারি হুড়াতে কমরেড বাবুলাল হেমব্রম-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড বাবুলাল হেমব্রম লাল সেলাম

রাজ্যের পতিত জমি চাহিদার চেয়ে বহুগুণ বেশি

একের পাতার পর

এর সত্য উত্তর দিতে হলে তাঁদের বলতে হয় — একচেটিয়া গোষ্ঠীর দাসানুদাস হিসাবে আমরা তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলেছি। তারা যা চাইছে আমরা তাই দিচ্ছি। সত্য কথা এ'টা, অথচ এ'টা বললে তাঁদের মান ইজ্জত থাকবে না। তাই ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টার মতো তাঁরা মিথ্যার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন।

সিপিএম নেতাদের গুরুতর একটা বিপদ হয়েছে এই যে — বামপন্থী বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সরাসরি তাঁদের বিরুদ্ধতা করছেন উর্বর জমি দখলের প্রশ্নে। এমনই এক বুদ্ধিজীবী ইতিহাসবিদ সুমিত সরকারকে লেখা এক চিঠিতে বুদ্ধদেববাবু বলেছেন — রাজ্যে পতিত জমি মাত্র ১ শতাংশ। ''এই পরিস্থিতিতে শিল্পায়নের জন্য কিছু কৃষিজমি কাজে লাগাতে হবে'' (গণশক্তি ২০-০১-০৭)। বুদ্ধদেববাবু তাঁর এই হিসাবটাও কষে দেখেছেন কি? দেখলে দেখতে পেতেন, তাঁর ওই এক শতাংশের হিসাবটাও, তাঁরা যা জমি চান তার চেয়ে বেশি।

কত জমি চাইছে রাজ্য সরকার? 'শিল্পায়নের' নামে রাজ্যের ন'টি জেলায় ১,৪০,৯৬৫ একর (সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান ১৭-১২-০৬) এবং বারুইপুরে ৫০০০ একর, মোট ১,৪৫,৯৬৫ একর।

রাজ্যে পতিত জমি কত? বুদ্ধদেববাবুর হিসাব অনুযায়ী মোট জমির এক শতাংশ। অর্থাৎ ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮২২ একর। অর্থাৎ তাঁরা যা জমি নিতে চাইছেন তার সাড়ে চৌদ্দগুণেরও বেশি।

কী করে হচ্ছে হিসাবটা? রাজ্যে মোট জমি ৮৬৮৭.৫৪ হাজার হেক্টর, অর্থাৎ ২১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮২ হাজার ২৩৮ একর জমি। বুদ্ধদেববাবুর হিসাবেই এর এক শতাংশ হ'ল ২১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮২২ একর।

রাজ্যের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের হিসাবে (২০০৩-০৪) পতিত জমি, মোট জমির ৪ শতাংশের বেশি, অর্থাৎ ৮৫,৮৩,২৮৮ একরেরও বেশি, সরকারের চাহিদার প্রায় ৫৮ গুণ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সরকারের জমির চাহিদা আর মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত পতিত জমির হিসাব মেলালেও কৃষিজমি অধিগ্রহণের কোন দরকার নেই।

অপরাধবিজ্ঞানে একটা কথা আছে, অপরাধী যত ধূর্তই হোক সে কিছু না কিছু সূত্র রেখে যায়, যা দিয়ে তাকে ধরা যায়। বুদ্ধদেববাবুর হিসাবেও সেই সূত্রটা রয়ে গিয়েছে।

আর একটা সহজ প্রশ্নেরও উত্তর নেই, তা হল, যদি সিপিএম নেতারা সত্যিই মনে করতেন, অকৃষি জমিতেই শিল্প করা উচিত, তবে কম থাক বেশি থাক, শুরুতে তারা অকৃষি জমিই নিতেন। তারপর যদি শিল্প গড়তে গড়তে জমির ঘাটতি পড়ত তখন কৃষি জমিতে হাত দিতেন। অর্থাৎ পতিত জমি দিয়েই তাঁরা শুরু করতেন। তা তাঁরা করেননি শুধু নয়, রাজ্যের সবচেয়ে উর্বর সিঙ্গুরে জমিদখল দিয়ে তাঁরা শুরু করেছেন। এ থেকেই পরিষ্কার, রাজ্যে পতিত জমি কম, নাচার হয়ে তাঁরা কৃষিজমি নিচ্ছেন — এ সবই দুরাত্মার ছল মাত্র। তাদের আসল লক্ষ্য একচেটিয়া টাটা-সালিমগোষ্ঠীর সেবাদাসত্ব করে তাদের দাবি পূরণ এবং তা ঢাকতে মিথ্যা কথায় লোকঠকানো।

সিঙ্কোনা বাগিচা খোলার দাবিতে শিলিগুড়িতে বিশাল মিছিল

২০ জানুয়ারি সিঙ্কোনা বাগিচা শ্রমিকদের প্রায় ৮০০ জনের একটি মিছিল শিলিগুড়ি জংশন থেকে হিলকার্ট রোড হয়ে শহীদ কমরেড তন্ময় মুখার্জীর বেদীর সামনে এসে পৌঁছায় এবং সেখানে এক জনসভা হয়। কুইনাইনের চাহিদা নেই — এই অজুহাত তুলে ১৫ বছর আগে সিঙ্কোনা উৎপাদনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকদের শুধুমাত্র বেতন ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই সিঙ্কোনা বাগিচা ডাবর এবং হিন্দুস্তান লিভারের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি চক্রান্ত শুরু হয়েছে। সিঙ্কোনা থেকে শুধুমাত্র কুইনাইন তৈরি হয় তাই নয়, পেটের অসুখের নানান ওষুধ, প্রসূতিকালীন মায়েদের জন্য বিশেষ ওষুধ তৈরি হয়। এছাড়া মংপুর রঞ্জুভ্যালিতে ট্যাক্সাস ব্যাকোটা বলে এক ধরনের গাছ পাওয়া যায় যা থেকে ক্যান্সারের ওষুধ তৈরি হয়। সিঙ্কোনা ছাড়াও কমলালেবু, রাবার, বড় এলাচ, বাঁশ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। সরকার ইচ্ছা করলে এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কর্মমুখী নানা ধরনের শিল্প স্থাপন করতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে যাবতীয় দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে তারা বাগিচা বেসরকারীকরণের চেষ্টা করছে, যার প্রতিবাদে পাহাড়ের এই শিল্পের পাঁচটি শ্রমিক সংগঠন, একত্রে ইউনাইটেড ফোরাম গড়ে তুলে এই চক্রান্তের প্রতিবাদ করতে আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছে। এই শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৬০০০ শ্রমিক নিযুক্ত। বেসরকারি হাতে চলে গেলে প্রায় ৩০/৪০ হাজার মানুষের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে। ফলে ২০ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্য দিয়ে নতুন করে আন্দোলনের সূচনা করা হয়। ঐদিনের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ফোরামের সভাপতি এল এম শর্মা, সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ গুরুং, ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর পক্ষে তপন ভৌমিক, এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষে বাসুদেব ঘোষ, এ বি টি জি এল ইউ-র পক্ষে প্রদীপ দেবনাথ, দার্জিলিং থেকে বিশিষ্ট যুবনেতা গোবিন্দ ছেত্রী, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডি এস ইয়ানজন প্রমুখ। শিলিগুড়ি জংশন থেকে মিছিলে নেতৃত্ব দেন গৌতম ভট্টাচার্য, শঙ্কর পাল, এল এম শর্মা, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ।

সিপিএম নেতারা নাকি রাজারহাটের চাষীদের সোনায় মুড়ে দিয়েছেন !

রাজারহাটে এক জনসভায় গত ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব বেশ কয়েক বছর আগে রাজারহাটে চাষীদের কৃষি ও বাস্তুজমি দখল করার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের কৃতিত্বের জয়ঢাক বাজিয়েছেন। কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে পরদিন তা প্রকাশিতও হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, 'আগেই বলে দিয়েছিলাম, প্রয়োজনে বাজার দরের থেকে দুইগুণ বেশি দামও হাঁকতে। তাই হয়েছে। সেই সময়ের বাজার দরের থেকে ৩০০ কোটি টাকা বেশি দামেই জমি নিয়েছে রাজ্য সরকার।' প্রশ্ন করি, চাষীরা সেই দাম শেষ পর্যন্ত পেয়েছে তো, গৌতমবাবু? নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, চাষীদের সেই দাম দিয়েছেন? রাজারহাটের চাষীদের দেওয়া সরকারি চেক ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত আসার সংবাদ তো গোপন নয়; বহু সংবাদপত্রেই তা প্রকাশিত হয়েছিল। দাম না পেয়ে চাষীদের বিক্ষোভ তো প্রকাশ্যেই ঘটেছিল। বহু দৈনিক সংবাদপত্রে এসব নির্মম বঞ্চনার তথ্য বহুদিন থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে। গৌতমবাবু সেগুলি কি ভুলে গেছেন, নাকি বেমালুম চেপে যাচ্ছেন? বিদেশি পুঁজিপতি সালিম গোষ্ঠীকে কৃষিজমি দেওয়ার বিষয়টি যখন এ রাজ্যে প্রকাশিত হয়, তখনই দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার এক প্রতিবেদক সরেজমিনে রাজারহাট ঘুরে এসে সেখানে জমিহারা কৃষকরা কেমন আছেন, তার ওপর একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ০৫) লিখেছিলেন; তার অংশবিশেষ এখানে প্রসক্রমে তুলে ধরা যেতে পারে ঃ ''বালিগুড়ি গ্রামের সাতশো কৃষক পরিবারের কয়েকশো বিঘা সরষের খেতে রাজ্য সরকারের পুলিশবাহিনী সিপিএম ক্যাডারদের সঙ্গে নিয়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি করলেও নামমাত্র টাকা দিয়ে কৃষকদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন অলিমুদ্দিন মোল্লা। তাঁর অভিযোগ, ১ লক্ষ টাকার সরষে ক্ষতি করে কৃষককে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১০ হাজার টাকা, যা কিনা কৃষকের চাষের খরচের থেকেও কম। এসব নিয়ে সিপিএমের কৃষকসভা তো নয়ই, এমনকী তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস কেউ তাঁদের পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ বালিগুড়ির আনসার আলি ফকির, মহম্মদ লস্কর, মামুদ আলি মোল্লাদের। ফসল ক্ষতি করে জমির দখল নিলেও বালিগুড়ির আসরাত, জিন্নাত, হাসেমরা কেউ কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি।'' পাথরঘাটার ''হবিবরের ২ বিঘা ৩ কাঠা জমির পুরোটাই গিলেছে নিউটাউন। জমি নিলেও এক বিঘা জমির দাম তিনি আজও পাননি বলে অভিযোগ। যে টাকা পেয়েছিলেন সে টাকা ৯ জনের সংসারে কর্পূরের মতো উবে গেছে মুহূর্তেই। ফসল ওঠার আগেই হিডকো জোর করে দখল নিয়েছে হবিবরদের জমি।...সরষে উঠলে ১০ হাজার টাকায় ঘর ছাওয়ার স্বপ্নও আর পূরণ হয়নি হবিবরের। হবিবরের পাশে দাঁড়ানো ইউনুস জানাল, তার দেড় বিঘা জমির সরষে সমেত খেত কেড়ে নিয়েছে হিডকো, নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে।'' এর নাম কি চাষীদের 'বাজার দরের চেয়ে বেশি দাম' দেওয়া?

শুধু তাই নয়,''বামফ্রন্ট সরকার ঘটা করে একদিন যে সমস্ত ভূমিহীনদের পাট্টা বিলি করেছিল, রাজারহাটের সেই জমিহারানো পাট্টাদারদের এক বড় অংশ আজও জমির ক্ষতিপূরণ পাননি। চক পাচুড়িয়ার তিন পাট্টাদার জুব্বার মোল্লা, গুলান মোল্লা, জলিল মোল্লা জমির ক্ষতিপূরণ না পেয়ে অকালে দুঃখ-কষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে এসব গরিব পাট্টাপ্রাপ্ত পরিবারের সদস্যদের। জুব্বার মোল্লার ছেলে রাজ্জাক মোল্লা পাগল হয়ে আজ ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে পথে পথে।'' ওঃ গৌতমবাবু, কী চমৎকার ক্ষতিপূরণের বহর আপনার ও আপনার সরকারের!

আর পুনর্বাসন? সে তো আরও চমৎকার! গৌতমবাবু তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'নির্দেশ ছিল, আগে পুনর্বাসন দিয়ে তারপর বাড়িতে হাত দিতে হবে। তাই হয়েছে।' বাঃ, হিটলারের প্রচারসচিব মিথ্যাচারী গোয়েবলসও বোধ হয় লজ্জা পাবেন। দৈনিক স্টেটসম্যানের প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে পুনর্বাসনের নামে গৌতমবাবুদের নির্লজ্জ ভ্রষ্টাচারের নির্মম বিবরণ ঃ ''জনে জনে বাবুদের পায়ে ধরে মাথা গোঁজার জন্য পুনর্বাসনের নামে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে হিডকো খগেন মণ্ডলকে এক কামরার একটি ঘর ভাড়া করে দেয়। ৮ জন সদস্যকে নিয়ে খগেনবাবু সেখানে উঠেছিলেন, গ্রামের লোক এটাই জানতো। কিন্তু তারপর কবে তাঁরা গোটা পরিবার কোথায় হারিয়ে গেছেন কেউ তার হদিশ দিতে পারেনি। একইভাবে ওই গ্রামের অসহায় বিধবা সরলাবালা মণ্ডলের শাক-পাতা বেচে দিন কাটতো। এছাড়া বাড়তি আয় বলতে ছিল ৪টে হাঁস, ২টো গরু, ৪টে মুরগি, গোটাকয়েক নারকেল গাছ। এসবের সামান্য আয়ে দুই উন্মাদ ছেলেকে নিয়ে কোনওমতে দিন কাটতো সরলাবালার। উন্নয়নের ঢেউয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়।... পুনর্বাসনের অছিলায় তাঁরা সরলাবালার পরিবারকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ৩ নম্বর গেটের কাছে একটা লোকদেখানো পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করে। সরলাবালা দুই ছেলেকে নিয়ে সেখানে ওই বাড়ির দখল নিয়েছিলেন বলেও জানা গেছে। তারপর দুই ছেলেকে নিয়ে সরলাবালা কোথায় হারিয়ে গেছে সে খবর কেউ রাখে না। আর সরকারি পুনর্বাসনের সেই ঘর তো কবেই ভেঙে হিডকো তাদের অফিস করেছে।''এরপরও গৌতমবাবু চাষীদের দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেবার গর্ব করেন?

আর গৌতমবাবু, আপনি রাজারহাটে জমিহারা কৃষকদের পরিবার পিছু একজনের চাকরি দেবার যে প্রতিশ্রুতি সে সময় দিয়েছিলেন, সেটা এখন বেমালুম চেপে যাচ্ছেন কেন? জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে আপনাদের সিপিএম সরকার রাজারহাটে কৃষকদের জমি দখল করার সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতিরই বা কতটা রেখেছেন? শুনুন সে কথা চাষীদেরই মুখে ঃ ''বালিগুড়ি মৌজার ডাঃ আব্দুল খালেক মোল্লা ছলছল চোখে বললেন, 'সরকার আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রতি পরিবারের একজনকে চাকরি দেবেন। এলাকার সাংসদ অমিতাভ নন্দী নির্বাচনের মুখে রাজারহাটে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কৃষকদের কাজের বিকল্প বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করবেন। কিন্তু কেউই কথা রাখেননি। তাই চুরি-ডাকাতি করা ছাড়া গ্রামের মানুষের কাছে বর্তমানে কোন বিকল্প পথ নেই।'' গৌতমবাবু, কে মিথ্যাবাদী — আপনি, নাকি ঐ হতভাগ্য চাষীরা! চাষীদের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদক লিখেছেন ঃ ''নিউটাউনে ভূমিহীন প্রতি পরিবারে একজনকে চাকুরি দেওয়া হবে, একথা বারবার বলা হলেও কৃষিজমিচ্যুত প্রায় ২০ হাজার কৃষক ও হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষিমজুর, সেই সঙ্গে কয়েক হাজার বর্গাদারের একজনও কোনও কাজ পাননি।'' আর সেই সুযোগে ''মহিষবাথান-২ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ক্ষিতীশ মণ্ডলের ছেলে গৌর মণ্ডল ও তার সাকরেদ রুহিষ দে'র অবস্থা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।... হিডকোর কাজ করে সাধারণ এক গ্রাম পঞ্চায়েতের ছেলে গৌর তারাপীঠে পেল্লাই হোটেল বানিয়েছে বলে জানা যায়।... আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেবের সঙ্গে গৌর-রুহিষের ওঠাবসার কথা সকলের জানা।'' গৌতমবাবু, নিউটাউন হয়েছে, আপনার গৌর-রুহিষদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, মালিকশ্রেণীর কাছে আপনারও খাতির বেড়েছে, কিন্তু রাজারহাটের চাষীরা কোথায় গেলেন, কেমন আছেন — তার কি কোন খোঁজ রাখেন?

আপনি বলেছেন,'রাজারহাটে জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে কখনোই পুলিশকে লাঠি, গুলি চালাতে হয়নি।' চালাতে হবে কেন? আপনিই তো জানিয়েছেন, 'এই জমি অধিগ্রহণের সময়ে আমরা একটি কমিটি তৈরি করেছিলাম। সেই কমিটিতে স্থানীয় তৃণমূল এবং বিজেপি'র প্রতিনিধিদেরও রাখা হয়েছিল।' ব্যস, এখানেই তো পোয়াবারো! কমিটির সবাই মিলে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিজেদের গহ্বরে অমৃত ঢুকিয়ে নিয়েছেন, আর বিষ উগরে দিয়েছেন অসহায় চাষীদের ওপর। আপনাদের পকেট মালিকশ্রেণীর টাকায় ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, আর চাষীরা হয়েছে সর্বস্বান্ত। এ অঙ্ক বুঝতে কোন অসুবিধা হয় কি?

মন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন, রাজারহাটে জমির দখল নিতে 'কোনও গোলমাল হয়নি।' এটা ডাহা মিথ্যা কথা। সেখানেও চাষীরা জমিরক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন; গড়ে তুলেছিলেন 'রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটি'। ফলে, চাষীরা প্রতিবাদ করেননি — এটা মিথ্যা কথা। প্রতিবেদক লিখেছেন ঃ ''রাজারহাটে শহর হলে গ্রামের মানুষের হাল ফিরবে, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন পাথরঘাটার হবিবর তাঁদের দলে ছিলেন না। রাজারহাট জমি বাঁচাও আন্দোলনে ছিলেন। জনে জনে গ্রামের লোককে বোঝানোর চেষ্টা করতেন নগরায়নের নামে এ সরকার আর এক নীলকরের ভূমিকায় আসরে নেমেছে। বিশ্বাস ছিল, সকলে মিলে জোট বাঁধলে রোখা যাবে সরকারের কৃষক মারার প্রয়াস।'' কিন্তু হবিবরদের সে বিশ্বাস বাস্তবায়িত হতে পারল না। কারণ, তাঁদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার মত সেদিন কাউকে তাঁরা পাশে পাননি। কংগ্রেস, তৃণমূল ও বিজেপি কখনোই আন্দোলনের শক্তি নয়। তাছাড়া, তাদের তো গৌতমবাবুরা আগেই কিনে নিয়েছিলেন। এস ইউ সি আই-এর মতো যথার্থ সংগ্রামী দল যদি সেখানে থাকতো বা চাষীরা যদি সেই শক্তিকে চিনে নিতে পারতেন, তাহলে গৌতমবাবুদের কাজটা এত সহজ হত না। রাজারহাট তখন হয়ে উঠত সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম। এই হ'ল রাজারহাটের ট্র্যাজেডি। সেই ট্র্যাজেডির জন্য গর্ব করছেন গৌতমবাবু! সিঙ্গুরে চাষীদের প্রতিরোধের ফলে সরকারের যে ফ্যাসিস্টসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, যে বর্বর পুলিশি অত্যাচার ঘটেছে, রাজারহাটে যেহেতু তা ঘটেনি, তাই রাজারহাট দেখিয়ে গৌতমবাবু জনদরদের ঢাক পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন সাজতে চাইছেন। কিন্তু সকলের স্মৃতি দুর্বল নয়, তদুপরি লিখিত রেকর্ডও রয়ে গেছে। এ রাজ্যের মানুষ জানেন, পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের তুষ্ট করতে তাঁরা রাজারহাটেও যেমন কৃষকদের প্রতারিত ও সর্বস্বান্ত করে চাষের জমি ও ভিটেমাটি কেড়ে নিয়েছেন, সিঙ্গুরেও বুদ্ধদেববাবুরা ঠিক একই জিনিষ করছেন এবং অন্যান্য জেলাতেও তাঁরা সেটাই করতে চলেছেন। কোন পার্থক্য নেই। কৃষকদের সক্রিয় প্রতিরোধই একমাত্র পারে এর যোগ্য জবাব দিতে।

জননেতা কমরেড আমির আলি হালদার স্মরণে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সভা

প্রতিবারের মতো এবারেও ১১ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রয়াত জননেতা এবং সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড আমির আলি হালদার স্মরণে আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রণব চ্যাটার্জীর নাম প্রস্তাব করেন কমরেড অশোক চক্রবর্তী এবং প্রস্তাব সমর্থন করেন কমরেড বাঁশীনাথ গায়েন।

সভার শুরুতে প্রয়াত কমরেড আমির আলি হালদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পার্টির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত এবং সভার সভাপতি কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমিরক্ষার আন্দোলনে শহীদদের উদ্দেশে দু'মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হয়।

প্রধান বক্তা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত, কীভাবে কমরেড আমির আলি হালদার পার্টির আদর্শ ও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিজের জীবনে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দলমত নির্বিশেষে এলাকার সকলের প্রিয় নেতা হিসাবে গড়ে উঠেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি সভায় উপস্থিত দলীয় কর্মী সমর্থক সহ প্রায় দুই শতাধিক কারা আবাসিকদের কাছে তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে দেখান, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দল কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমি অধিগ্রহণের নেশায় তাদের কালো থাবা বসিয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, শিল্পায়নের নাম করে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম পরিচালিত মার্কসবাদী নামধারী শাসকদল সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শাসক দলগুলিও গরিব চাষী মজুরের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার এক উদগ্র বাসনায় মেতে উঠেছে, মানুষকে নিঃস্ব রিক্ত ও ভূমিহীনে পরিণত করতে চাইছে। তিনি বলেন, ভোটদানের মধ্য দিয়ে শাসকদলের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু মানুষ শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাবে না। তাই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বারুইপুর কিংবা কুলপীর জমি বাঁচাও আন্দোলনকে যদি পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত না করা যায় তাহলে মানুষের শোষণ থেকে মুক্তি নেই। তাই আমাদের দল কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে চাইছে বলেই পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিভূ শাসকদল আমাদের দলের কর্মী-সমর্থক ও নেতাদের মিথ্যা-মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে এবং সেই আন্দোলনের গতিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা মূর্খ — তাই জানে না সত্যিকারের বিপ্লবী শক্তিকে কখনো রোখা যায় না।

সবশেষে তিনি বলেন, আসুন আমরা যারা এই কারাগারে বন্দি আছি, তারা সকলে মিলে কারাভ্যন্তরে নিজেদের মধ্যে আলাপআলোচনার মধ্য দিয়ে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করি, যাতে বাইরে পার্টি যে আন্দোলন করছে তাকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে পারি।

এরপর প্রয়াত কমরেডের প্রতি লাল সেলাম জানিয়ে স্লোগানের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়।

বিশ্বায়নের প্রয়োজনেই ফ্রিডম্যানকে বিস্মৃতি থেকে তুলে এনেছে বুর্জোয়ারা

গত ১৬ নভেম্বর খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানের মৃত্যুর পর ২২ নভেম্বর আনন্দবাজারে অভিরূপ সরকার তাঁর রচনায় ফ্রিডম্যানকে 'ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী' এবং 'মুক্ত ধনতন্ত্রের পূজারী' আখ্যা দিয়েছেন। ওই দিনই দ্য স্টেটসম্যান তাদের শ্রদ্ধার্ঘে তাঁকে 'এ ম্যান অব রিজন' (খাঁটি যুক্তিবাদী) আখ্যা দিয়েছে এবং ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তার প্রধান রচয়িতা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সম্পর্কে ফ্রিডম্যানের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে ফ্রিডম্যান তাঁর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। বুর্জোয়া দুনিয়া তাঁকে নোবেল প্রাইজ দিয়েছে আরও ১৫/২০ বছর বাদে, ১৯৭৬ সালে। এত বিলম্ব? এমন একজন যুক্তিবাদী অর্থনীতিবেত্তার মূল্য বুঝতে এত দেরি কেন? তাছাড়া বিশ শতকের মধ্যভাগে গোটা পুঁজিবাদী বিশ্ব যখন কেইন্‌সীয় দাওয়াই নিয়ে মশগুল, তখনও ফ্রিডম্যান মুক্ত বাজারের পক্ষে সাহসের সঙ্গে বলেছিলেন — এইভাবে তাঁর যে প্রশংসা হচ্ছে সেটাই বা কতটা সত্য?

এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের বুর্জোয়া অর্থনীতির সংকটের পটভূমিতে বিষয়টা বুঝতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে মহামন্দার কবলে পড়েছিল তা থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ বাতলেছিলেন কেইন্‌স। বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিকাশের যুগে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন তা ছিল প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার অর্থনীতির তত্ত্ব। তাঁরা মনে করতেন, অর্থনীতিকে বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। তখন তাতে কাজও চলছিল এবং সেটাকে অভ্রান্ত মনে করা হচ্ছিল। সেই যুগে বসেই মার্কস বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে বুর্জোয়া অর্থনীতির অনিবার্য সংকট ও নৈরাজ্যের যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান, পিছন ফিরে দেখলে আজ তা অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই মনে হয়। পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার ফলে বৃহৎ পুঁজি ক্ষুদ্র পুঁজিকে গিলে ফেলবে এবং পুঁজির ক্রমপুঞ্জীভবন ঘটবে, একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব হবে এবং অনিবার্য বাজার সঙ্কট দেখা দেবে — পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই ভবিতব্য মার্কসই দেখিয়ে যান। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব ও ত্রিশের দশকের মহামন্দা এবং ধারাবাহিক পুঁজিবাদী সঙ্কট মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের সিদ্ধান্তকে নির্ভুল প্রমাণ করে।

মহামন্দার সময় কেইন্‌স বুর্জোয়া ব্যবস্থার ত্রাতার ভূমিকা নেন। মুক্তবাজারের বিপরীতে তিনি বলেন, অর্থনীতিকে মুক্তবাজারের ওপর ছেড়ে দিলে হবে না। সরকারকে উদ্যোগী হয়ে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং বাজার সৃষ্টি করতে হবে। কেইন্‌সের এই তত্ত্ব যুগান্তকারী ছিল এই অর্থে যে, তা বুর্জোয়া দুনিয়ার দীর্ঘদিনের মুক্তবাজার তত্ত্বের ঠিক বিপরীত।

ত্রিশের দশকে কেইন্‌সের দেওয়া এই দাওয়াই পুরোদমে ব্যবহার করে উড্রো উইলসনের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কেইন্‌স তার মূল দাওয়াইয়ের সঙ্গে নানা অনুপান ও পথ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেগুলো দিলে ওষুধ কাজ করবে। যেমন তিনি দেখান, বাজারে চাহিদা বাড়াতে গেলে সরকারি খরচ বাড়াতে হবে, লোকের হাতে টাকা দিতে হবে। তিনি দেখান, মানুষ যা আয় করে সেই আয়ের একটা অংশ তারা সঞ্চয় করে, একটা অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে। ভোগব্যয়ের অংশটা বাড়াতে পারলে বাজারে চাহিদা বাড়ে। ধনীর আয় বাড়লে ভোগব্যয় তত বাড়ে না, সঞ্চয় বাড়ে বেশি। গরিব মধ্যবিত্তের সঞ্চয় করার ক্ষমতা কম, তাই তাদের আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়ে বেশি। কিন্তু এগুলো কেইন্‌সীয় তত্ত্বের মূল দাওয়াই নয়, এগুলো পথ্য বা অনুপান। অর্থাৎ এগুলি হল সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে চাহিদা বাড়াবার মূলনীতি কার্যকর করার উপায়।

মিল্টন ফ্রিডম্যানকে তাত্ত্বিক দিক থেকে মনিটারিস্ট গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা হয়। মনিটারিস্টরা মনে করে, বাজারে পণ্যের যোগান ও টাকার যোগানের অনুপাতের ভারসাম্য হারানোই অর্থনীতির সঙ্কটের কারণ। তাই তারা বাজারে টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতির সঙ্কট নিরসনের কথা বলে। ফ্রিডম্যান বলেন, অর্থনীতির উপর সরকারি হস্তক্ষেপ দরকার নেই। ওটা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়াই সঠিক পথ। তিনি বলেন, কেইন্‌স খুব ক্ষুদ্র সময়সীমায় ভোগব্যয়ের দিকটা ভেবেছেন। আসলে দীর্ঘমেয়াদি বিচারে দেখা যাবে, বাজারে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং ভবিষ্যৎ আয় নিশ্চিত থাকবে — এই আশ্বাস পেলে মানুষ খরচ করবে বেশি, জমাবে কম। যেমন ভবিষ্যতে পেনশন পাবেন এবং বাজারদর এত বাড়বে না — এটা জানলে চাকরিজীবী বেশি খরচ করতে চাইবে এবং করতে ভয় পাবে না, নইলে জমাতে চাইবে বেশি। কাজেই স্থিতিশীলতা ও আয় সম্পর্কে আশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য বাজারে টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করলেই হবে। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা সবটা বাজারের ওপর ছাড়ার কথা বলেছিলেন, মনিটারিস্টরা টাকার জোগান নিয়ন্ত্রণে রেখে মুক্তবাজার চালু করার কথা বলেন।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী বিশ্ব তার সঙ্কট থেকে বাঁচতে কেইন্‌সীয় দাওয়াইকেই উপযুক্ত ভেবেছিল, তাই ডাক্তার ফ্রিডম্যানকে তারা ডাকেনি। সরকারি খরচ বাড়িয়েই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি সংকট সামলাচ্ছিল, এবং দ্রুতগতিতে বিকাশমান সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দেবার অক্ষম চেষ্টা করছিল। কিন্তু শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগণের মঙ্গলের জন্য যা করতে পারে, মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদ তা করতে পারে না। পুঁজিবাদের এই জনবিরোধী চরিত্রকে আড়াল করতে পুঁজিবাদের স্বার্থেই তারা সরকারি খরচ বাড়ানোর দ্বারা কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করছিল এবং দেখাচ্ছিল কেবল সমাজতন্ত্র নয়, পুঁজিবাদও জনগণের জন্য কাজ করে। কিন্তু জনকল্যাণমূলক কাজের কৌশলটা তারা বেশিদিন চালাতে পারেনি। তার উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পাশাপাশি পুঁজিবাদী দুনিয়া একটা জোরালো রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। দুর্ধর্ষ হিটলারবাহিনীকে পরাজিত করে স্ট্যালিন নেতৃত্ব ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বে গণতন্ত্র ও মানবতার একমাত্র রক্ষাকর্তার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুনিয়ার জনগণের কাছে পরম কাম্য হয়ে ওঠে। বিশ্বের জনগণের এহেন সমাজতন্ত্রমুখী মনোভাবে সাম্রাজ্যবাদ- পুঁজিবাদ বিপদ গোনে। ফলে সমাজতন্ত্রকে ঠেকাতে তারা সামরিক পেশী আস্ফালনের পথ নেয়। এজন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি সরকারি ব্যয়কে সামরিক খাতে চালান করে। সঙ্কটজর্জরিত পুঁজিবাদ এইভাবে অর্থনীতির সামরিকীকরণ করে এবং তা ক্রমাগত বাড়িয়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঠেকানোর চেষ্টা করে।

এই কাজে সরকারি ব্যয় বাড়াতে বাড়াতে যখন বাজেট ঘাটতি আকাশচুম্বী হয়ে দাঁড়ায় এবং ঋণের দায়ে মাথা পর্যন্ত ডুবে যায় তখন মার্কিন সরকার ও ব্রিটিশ সরকার বলে, অর্থনীতিক্ষেত্রে পয়লা নম্বর শত্রু হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। কাজেই তারা সরকারি ব্যয় কমাবার কথা ঘোষণা করে। সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দেওয়া, বৃহৎ পুঁজিপতিদের কর কমিয়ে দেওয়া প্রভৃতি পদক্ষেপ নেওয়ার সময় রেগন এবং থ্যাচার অ্যাকাডেমিক বইয়ের পাতা থেকে মিল্টন ফ্রিডম্যানকে প্রচারের আলোয় আনেন। সেই সময়ই, অর্থাৎ, অনেক বিলম্বে ১৯৭৬ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সেরা অর্থনীতিবিদ বলে প্রচার শুরু হয়। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, ফ্রিডম্যান যখন তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন, তখন বুর্জোয়াদের তাঁকে দরকার ছিল না। তাই অ্যাকাডেমিক পরিধির বাইরে তাঁকে আনা হয়নি। এখন খোলাবাজার অর্থনীতির ধোঁকাবাজি বুর্জোয়াদের দরকার। তাই তাঁকে যুগন্ধর অর্থনীতিবিদ হিসাবে দেখানো হচ্ছে। এই কারণেই বর্তমান বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণের ঢালাও প্রচারের যুগে এহেন ফ্রিডম্যান বুর্জোয়াদের চোখে আবার নতুন করে সাচ্চা যুক্তিবাদী হয়ে উঠবেন — এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ফ্রিডম্যান বোধহয় বুঝতেন যে, একচেটিয়া পুঁজির যুগে মুক্ত বাজারের তত্ত্ব খাটবে না। তাই তিনি বলেছিলেন — যে সব একচেটিয়া গোষ্ঠী রয়েছে, সরকারকে তা ভাঙতে হবে। কাজটা অসম্ভব। কারণ পুঁজিবাদে একচেটিয়াকরণ ঘটবেই। ফ্রিডম্যান বলেছেন, এই একচেটিয়া ভাঙার কাজ সরকারকে করতে হবে। একদিকে অর্থনীতিকে সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত রাখার কথা বলা, অন্যদিকে সরকার কর্তৃক বৃহৎ পুঁজিপতিদের কর ছাড় দেওয়া, বেসরকারি পুঁজির লুণ্ঠনের পথ খুলে দেওয়া — এই যদি নীতি হয়, তাহলে আর সরকারি হস্তক্ষেপের বাকি থাকে কী! অর্থাৎ ফ্রিডম্যান বা অন্য মনিটারিস্টরা সকলেই সুকৌশলে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে ঘুরিয়ে সরকারি সহায়তার কথাই বলেছেন। সেই অর্থে এগুলি কেইন্‌সীয় মূল দাওয়াইয়েরই সম্প্রসারণ, উনিশ-বিশ তফাৎ অনুপানে বা পথ্যে।

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদরা মালিকশ্রেণীর দেওয়া চশমা পরে যে সত্যটা দেখতে পাননি, মার্কসবাদীরা সে সত্য অনেক আগেই ধরে ফেলেছে। মার্কসীয় পদ্ধতিকে বিচার করে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই পুঁজিপতিশ্রেণীর পুরোপুরি সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের ন্যূনতম নিরপেক্ষতা আর নেই। এজন্যই ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য যে ভারতীয় পুঁজির শক্তিবৃদ্ধি করা এবং সেজন্যই ভারি শিল্পে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের প্রেসক্রিপশন, এও তিনি দেখিয়েছেন। যেহেতু ভারিশিল্পে পুঁজি লাগে বেশি এবং মুনাফা আসতে দেরি হয় তাই ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় পুঁজি ঢেলে ভারি শিল্প গড়ে দিচ্ছে ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থে — পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই শ্রেণীউদ্দেশ্য কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। রোগগ্রস্ত পুঁজিবাদকে নিরাময়ের ডাক্তার ফ্রিডম্যান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যটাই হয় ধরতে পারেননি, নয় গোপন করেছেন। তিনি বলেছেন — আমার মতে (ভারতের) পরিকল্পনার ফলে বিপুল পুঁজি ও শ্রম নষ্ট হবে। ভারি শিল্প গড়া ও কুটির শিল্পকে সহায়তা — এই দুই পদক্ষেপ থেকে ভারত কিছুই পাবে না। (স্টেটসম্যান ২২-১১-০৬) বস্তুত ভারতীয় জনগণ দারিদ্র্য ও বঞ্চনা ছাড়া কিছু না পেলেও, ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুফল তুলে পুষ্ট হয়েছে শুধু নয়, ভারতীয় বহুজাতিক সংস্থা এখন বিপুল পুঁজি বিদেশে রপ্তানি করছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছে।

মিল্টন ফ্রিডম্যানকে বিস্মৃতি থেকে টেনে তুলে এনে দেখানো হচ্ছে — পুঁজিবাদ যেন মুক্তবাজারের যুগে ফিরে গিয়েছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। হাজার হাজার কোটি টাকা কর ছাড়, রপ্তানি ভর্তুকি সহ হাজার একটা সরকারি ভর্তুকি পেয়েও ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে আছে পুঁজিবাদ শুধু এই কারণে যে, তাকে আঘাত করে বিপ্লবের জয়যাত্রা ঘটাবে যে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ তারা আদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে যতটা শক্তিশালী ও সংহত হওয়া প্রয়োজন ততটা নয়। পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকেরা যতই জয়গান করুন, সঙ্কট থেকে পুঁজিবাদ রক্ষা পাবে না। সঙ্কটের পর সঙ্কট আসবে। কেইনস, ফ্রিডম্যান, ফিলিপস-এর মতো 'ডাক্তাররা'ও ঘুরে ফিরে আসতেই থাকবেন। সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে মেহনতি জনতার সংঘবদ্ধ বিপ্লবী শক্তিই পুঁজিবাদকে খতম করে সমাজতন্ত্রের বিজয়পতাকা ওড়াবে। সেই প্রস্তুতি গড়ে তোলারই ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই।

হুগলি

এ আই এম এস এস-এর প্রতিবাদ সভা

সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের কর্মী তাপসী মালিকের হত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং নন্দীগ্রামে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে গত ১২ জানুয়ারি অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে শ্রীরামপুর স্টেশন চত্বরে মা, বোনেদের এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সিঙ্গুর সহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলারা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী আশালতা সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যেমনভাবে এক হয়ে লড়েছিলেন তেমনি করে মা বোনেদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সিঙ্গুরে আন্দোলনকারী মহিলাদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন কাজল দাস, চম্পা কোলে ও যূথিকা পাল। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পরিচারিকা সমিতির রাজ্যনেত্রী কমরেড লিলি পাল। এ আই এম এস এস-এর রাজ্য কমিটির সদস্যা কমরেড ভারতী রায় তাঁর বক্তব্যে সিঙ্গুরের আন্দোলনকারী মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ'রাজ্যে সিপিএম শিল্পায়নের নামে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করছে। অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস ও এনডিএ শরিকরা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করে চলেছে। লড়াইটা তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর সরকারগুলির বিরুদ্ধে।

লিট্‌ল আন্দামানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার ইতিহাস এবং সংগ্রামী মনীষীদের জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষা তুলে ধরার লক্ষ্যে দলের উদ্যোগে গঠিত লিট্‌ল আন্দামান এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল কমিটি রামকৃষ্ণপুরে (১৬ কিমি) কমিউনিটি হলে ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১১০তম জন্মবার্ষিকী পালন করে। এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক পরিতোষ কুমার মণ্ডল, সুব্রত রায়, মহাদেব সর্দার, জ্ঞানেন্দ্র ঘরামি নেতাজীর জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে উদ্যোক্তাদের এই মহতী প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত প্রায় এক হাজার মানুষের কাছে আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যা দীপা বল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমিটির সদস্য প্রসাদ সর্দার। অনুষ্ঠানে গান-নাটক পরিবেশনায় এলাকার ছাত্র-ছাত্রী-নারীপুরুষের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠান সংগঠিত করতে কমিটির বিশিষ্ট সংগঠক বাবলু মিত্র, কৃষ্ণপদ মণ্ডল, সুকুমার মণ্ডল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। শেষে কমিটির সম্পাদক মোহন মিস্ত্রি এলাকার অধিবাসীদের সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কোন নেতা বা দলকে অন্ধের মতো মানবেন না

বারুইপুরের জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

কৃষকদের উচ্ছেদ ও হত্যা করে কৃষিজমি দখল করার প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি বারুইপুরে জনসমাবেশের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি। রেল স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে রাসমাঠ ছিল এই জনসভার স্থান। বহু রাজনৈতিক সভার সাক্ষী এই ময়দান। সেদিন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল এস ইউ সি আইয়ের জনসভার মধ্য দিয়ে— যেকথা বারুইপুরের মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। বারুইপুরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিজমি সরকারি দখল অভিযানের আওতায় পড়েছে। উদ্বিগ্ন চাষীরা প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলেছেন গণকমিটি। এস ইউ সি আই কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষকে একথা বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন যে, সংগঠিত হয়ে নিজেরা নিজেদের সংগ্রামের প্রস্তুতি না গড়ে তুলতে পারলে সরকারি আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না। ২০ জানুয়ারি এস ইউ সি আইয়ের জনসভাকে ঘিরে শহরের মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে গাঁয়ের চাষী, খেতমজুর সকলের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা। গরিব কৃষকরা জানত, বাস-লরি করে মানুষ এনে এস ইউ সি আইয়ের জনসভা হয় না। তাই ট্রেনে, ভ্যানে, চলতি বাসে, যারা যেমনভাবে পেরেছে দলে দলে জনসভায় যোগ দিয়েছে। এই জনসভা কত বড় হবে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা ছিল। দুপুরের পর যখন মিছিলের ঢল নামল মাঠের দিকে, দেখতে দেখতে প্রায় দশ হাজার মানুষ জমা হল, বিস্ময়ে হতবাক সকলে। মাত্র কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী এই মাঠেই জমি দখলের সমর্থনে সভা করে গিয়েছেন। মাঠের আশেপাশের দোকানদাররা এক বাক্যে বলে উঠলেন, অনেক বাস ও লরি করে মানুষ এনেও এত বড় সভা করতে পারেনি সিপিএম। এত বিশাল সভা যে এমন সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে, এ তারা ইতিপূর্বে অনেকেই দেখেননি। মাঠে ঢোকার মুখে এক চা-বিক্রেতা বার বার কর্মীদের বলছিলেন, অনেক মিটিং দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। আপনাদের কিছুদিন অন্তর এই মাঠে মিটিং করা দরকার। কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্যের যে কথাটা চাষীদের মুখে মুখে ঘুরছে তা হল, এস ইউ সি আই ভোটের স্বার্থ নিয়ে আন্দোলন করে না। শোষিত মানুষকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করার বৈপ্লবিক লক্ষ্য নিয়েই গণআন্দোলন পরিচালনা করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অজয় সাহা সভার সূচনা করে বলেন, বারুইপুরে জেলার সদর দফতর করার প্রলোভন দেখিয়ে সরকার কৃষিজমি দখলে নেমেছে। অথচ যে সুবিধা পাওয়ার জন্য এ জেলার মানুষ বারুইপুরে সদর দফতর চেয়েছিলেন সরকারের প্রস্তাবিত প্রকল্প দিয়ে তা আদৌ পূরণ হবে না। প্রধান বক্তার ভাষণে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রথম সিঙ্গুরে ও পরে নন্দীগ্রামে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে, খানিকটা ধাক্কা খেয়ে সিপিএম সরকার এখন বলছে, আমরা ধীরে চলব। এটা অত্যন্ত ধূর্ত কৌশল। কিছুটা সময় নিয়ে মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, অনৈক্য এবং দালাল সৃষ্টি করে আন্দোলনকে কী করে ভেঙে দেওয়া যায়, কী করে আবার জমি দখল করা যায়, সেই কৌশল নিয়ে সরকার এগোচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার যদি সত্যিই শিল্পায়নের প্রশ্নে আন্তরিক হত তা হলে রাজ্যের বন্ধ ৫৬ হাজার কলকারখানা খুলত, ছাঁটাই ১৫ লক্ষ শ্রমিককে পুনর্নিয়োগ করত। সে পথে না গিয়ে সরকার শিল্পায়নের ধাপ্পা দিয়ে জনগণকে ভোলাতে চাইছে। সিপিএম নেতারা কর্মীদের বোঝাচ্ছেন, কৃষিতে বেশি লোক থাকলে সেটা পিছিয়ে থাকার লক্ষণ। তার জন্য কৃষিতে এখনও যাদের একবেলা আধপেটা খাবার জুটছে তাদের কৃষি থেকে তুলে রাস্তার ভিখারি বানিয়ে দাও। এইসব অদ্ভুত তত্ত্ব তাঁরা আমদানি করছেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, শুধু লড়াই করলে, রক্ত দিলেই হবে না। আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দুঃখ করে বার বার বলেছেন, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সুভাষ বোসরা যা চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার হাজার কোরবানি সত্ত্বেও তা পাওয়া গেল না কেন? কারণ জনগণ লড়াইকে সমর্থন করলেও রাজনীতি বুঝতে চায়নি। নেতৃত্বের রাজনৈতিক চরিত্র বুঝতে চায়নি। অন্ধের মতো চলেছে। তাই তিনি বলেছেন, লড়াইয়ের মধ্যে ঠিক করতে হয়, কে মূল শত্রু এবং তার বিরুদ্ধে কোন আদর্শ-নীতি নিয়ে এবং কোন্ পথে লড়ব। এ না হলে আন্দোলনও বিপথগামী হয়ে যাবে। আজকে আপনাদের জমিরক্ষার আন্দোলনও ভোটবাজ দলগুলো কব্জা করে ভোটের স্বার্থ রক্ষা করবে।

পরিশেষে তিনি বলেন, জনগণের এ লড়াই হবে দীর্ঘস্থায়ী। দু' পাঁচ দিনের লড়াই এটা নয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার পুলিশ মিলিটারি নিয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধে নামবে। তাকে মোকাবিলা করে লাগাতার আন্দোলন করতে হবে। তার জন্য চাই গণকমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী। প্রতিটি গ্রামে গণকমিটি করুন। এই গণকমিটিতে সমস্ত দল, যারা আন্দোলন চায়, ঐক্যবদ্ধ হোক। আপনারা সকলের বক্তব্য শুনবেন, বিচার করবেন, কিন্তু নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন। কোন নেতাকে বা কোন পার্টিকে অন্ধের মতো মানবেন না, তা হলে ঠকবেন।

কৃষিতে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কোচবিহারে জনসভা

সিপিএম সরকার খুচরো ব্যবসায় যেভাবে রিলায়েন্স গোষ্ঠীকে ঢোকার রাস্তা করে দিচ্ছে, তাতে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ খুচরা ব্যবসায়ী বিপন্ন হবে। এ রাজ্যের অসংখ্য ছোট চাষী যারা এমনিতেই ফসলের ন্যায্য দাম পায় না, কৃষি ব্যবসায় আম্বানিদের মতো একচেটে পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলে তাদের উপর শোষণের এই মাত্রা আরও তীব্র হবে। রিলায়েন্স গোষ্ঠী কোচবিহার জেলার কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা, হলদিবাড়িতে বিপনন কেন্দ্র খোলার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জমি চেয়েছে। এ সংবাদে জেলায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। রিলায়েন্সের মতো একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীকে জমি দেওয়ার প্রতিবাদে এবং শিল্পায়নের ভাঁওতা দিয়ে টাটা-সালিমদের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে কোচবিহার, মেখলিগঞ্জ, দিনহাটার গোসানীমারী এবং কোচবিহার সদরের ডাঙ্গারহাটে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি সভাতে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু।

১৮ জানুয়ারি কোচবিহার শহরের লালদিঘীর পাড়ে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কাজল চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড নেপাল মিত্র। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার, কমরেড সত্যেন ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৯ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে জনসভার আগে দুই সহস্রাধিক কর্মী ও সমর্থক বাজারে মিছিল করেন। কমরেড অবিরাম রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছাড়াও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আশীষ গাঙ্গুলী বক্তব্য রাখেন। ২০ জানুয়ারি গোসানীমারী বাজার সংলগ্ন মাঠে কমরেড পুলিন রায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরুর আগে দুই শতাধিক কর্মীর এক মিছিল বাজার পরিক্রমা করে। সভায় বহু সাধারণ মানুষ যোগ দেন। কমরেড গোপাল কুণ্ডু ছাড়াও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অসিত দে বক্তব্য রাখেন। ২১ জানুয়ারি ডাঙ্গারহাটের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সাহেবেরহাট লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড বাবলু রায়। প্রত্যেকটি জনসভাতেই প্রধান বক্তা কমরেড গোপাল কুণ্ডু কৃষিজমি দখলের প্রতিবাদে এবং অকৃষি ও অনুর্বর জমিতে শিল্প করার দাবিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মহামিছিল সফল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

মুর্শিদাবাদের সভায় কমরেড মানিক মুখার্জী

একের পাতার পর

তৃণমূলের মত সংসদীয় দলগুলোও এ রাজ্যে জমিরক্ষার আন্দোলন করছে। এরাই বিশ্বায়নের প্রবক্তা। অন্য রাজ্যে কংগ্রেস-বিজেপি চাষীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। সিপিএম সেখানে আন্দোলন-আন্দোলন খেলা খেলছে।

তিনি পরিশেষে বলেন, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শোষণকে আরও তীব্র করতে সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছে। সাধারণ মানুষ তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। আমরা মানুষের সাথে আছি। মানুষের শক্তিতে লড়ি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা-চিন্তা আমাদের একমাত্র হাতিয়ার। রাজ্যজুড়ে গড়ে ওঠা ব্যাপক গণআন্দোলনকে সঠিক লক্ষ্যে ও নেতৃত্বে পরিচালনা করতে হবে। খেটে খাওয়া মানুষের কাছে এস ইউ সি আই একমাত্র গণআন্দোলনের ভবিষ্যৎ।

সভার সূচনায় সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় জমি কিনে তা বিনামূল্যে সমস্ত রকম সুযোগসুবিধা সহ শিল্প-মালিকদের দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য। তিনি বলেন, এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেও আমাদের নেতৃত্বে আন্দোলনে অনেক প্রাণ বলিদান হয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এদেশে আন্দোলনের অভাব হয়নি। গমকে গমকে তা বার বার ফেটে পড়তে চেয়েছে। কিন্তু অভাব হয়েছে একটাই, তাহল গণআন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব। ফলে রাজ্যজুড়ে চাষী, খেতমজুরের লড়াইকে সঠিক সর্বহারার দল এস ইউ সি আই-এর পতাকাতলে সংগঠিত করতে হবে।

এদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বিদ্যুৎ আন্দোলনের নেতা কমরেড কুণাল বিশ্বাস। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার পরিসমাপ্তি হয়।

সভার শেষে সন্ধ্যায় দিশারী ভবনে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটি ও লোকাল কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সকল গণসংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী সংগঠনে আদর্শচর্চার পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া এবং তাকে ভিত্তি করে চাষী আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠকদের সময়োচিত যথাযথ ভূমিকা গ্রহণের জন্য বিশেষ আহ্বান জানান।

অবস্থান মঞ্চ থেকে বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান

একের পাতার পর

রেখে ওপর ওপর ফ্লাইওভার, শপিংমল, মালটিপ্লেক্সের প্রসাধনী প্রলেপকে উন্নয়ন বলে মেনে নিতে পারছি না।

কবীর সুমন বলেন, টাটাকে জমি দেওয়ার জন্য বুদ্ধদেববাবু সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা ভরতুকি দিচ্ছেন। অন্যদিকে শাসকদলের বিরোধিতা করলেই তার গায়ে একটা রাজনৈতিক ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিল্পস্থাপনের জন্য উর্বর কৃষিজমি দখলের তিনি বিরোধিতা করেন।

অপর্ণা সেন বলেন — আমি মানবিকতার টানে এখানে এসেছি। গণতান্ত্রিক রাজ্যে প্রতিবাদ থাকবেই। শিল্পের জন্য অনুর্বর জমিই নেওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পতিত জমি মাত্র এক শতাংশ। এটা সত্য হলে তাঁদের উচিত সেই পতিত জমি থেকে শুরু করা। তিনি বলেন — সরকার বলছে, সিঙ্গুরে চাষীরা স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছেন, তাহলে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছে কেন?

শাঁওলি মিত্র বলেন, শেষপর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথও আমাদের সেটা দেখিয়েছেন রক্তকরবী নাটকে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের সঙ্গে তিনি রক্তকরবী নাটকের প্রাসঙ্গিক অংশ একক পাঠ করেন। বক্তব্য রাখেন অর্পিতা ঘোষ, সুনন্দ সান্যাল, গৌরীশঙ্কর ঘটক, চির দত্ত প্রমুখ।

অবস্থান মঞ্চের পাশেই এক বিরাট ক্যানভাসে সম্মিলিতভাবে ছবি এঁকে ধিক্কার জানান চিত্রশিল্পীরা। কবিরা প্রতিবাদী কবিতা পাঠ করেন। সংগীত ও নাট্যগোষ্ঠী গান ও পথনাটিকা পরিবেশন করে।

সভার সূচনাপর্বে নন্দীগ্রামের সংগ্রামী কৃষক নেতা নন্দ পাত্র তাঁর বক্তব্যে আগামী দিনে আরও তীব্র প্রতিরোধের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

সভা শেষে অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বলেন — আমরা অরাজনৈতিক নই। কিন্তু এই মঞ্চের বনিয়াদ হল মানবতা, মানবাধিকার। কেবল সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামেই নয়, যেখানে যখনই মানবতাবিরোধী কিছু ঘটবে তার প্রতিবাদ করার লক্ষ্য নিয়েই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে এই মঞ্চের সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হবে।

অবস্থান আয়োজনের ও পরবর্তী কর্মসূচির অর্থ সংস্থানের জন্য উপস্থিত মানুষের কাছে অর্থদানের আবেদন তিনি রাখেন, তাতে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে অর্থ দান করেন। মঞ্চ থেকে প্রস্তাবিত আহ্বায়ক কমিটি, আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে তরুণ সান্যাল ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে অজন্তা ঘোষের নাম সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের লুঠের কবলে ইরাক

ইরাকে আরও ২১ হাজার ৫০০ জন মার্কিন সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল জর্জ বুশের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সরকার। ইতিমধ্যে সেখানে মোতায়েন রয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার সেনা। তাদের পিছনে খরচ হয়ে চলেছে হাজার হাজার কোটি ডলার। আরও ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) ডলার অর্থ এই যুদ্ধের পিছনে খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জর্জ বুশ। এই বিপুল টাকা আসছে জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে, নয়ত বিপুল ঋণের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে। সামরিক খরচ থেকে মুনাফা লুঠছে মার্কিন অস্ত্রব্যবসায়ীরা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দখলদারির বিরুদ্ধে গত চার বছর ধরে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইরাকের দেশপ্রেমিক মানুষ। প্রতিরোধের আগুন ক্রমাগত তীব্রতর হয়ে উঠছে। মার্কিন হানাদার বাহিনী সেই প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াতে পারছে না। ইতিমধ্যে সেখানে নিহত হয়েছে ৩ হাজার মার্কিন সেনা, আহতের সংখ্যা অগণন। আমেরিকার মাটিতেও যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ বাড়ছে। মার্কিন মায়েরা দাবি তুলছেন — আমাদের সন্তানদের ইরাক থেকে ফিরিয়ে আনো। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে 'ইরাক স্টাডি গ্রুপ'-এর মতো সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শদাতা সংস্থা জর্জ বুশের সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, ইরাকে যেকোন সময়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ঘটতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নিজেদের দুর্বলতা গোপন করার মরিয়া চেষ্টাতেই ইরাকের পুতুল সরকারের আদালতকে দিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের হত্যার আদেশ কার্যকর করালো বুশ প্রশাসন। এ সেই মার্কিন সরকার, যারা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, প্রমাণ ছাড়াই বিচারের প্রহসন ঘটিয়ে এবং বিশ্বজনমতকে অগ্রাহ্য করে মার্কিন নাগরিক রোজেনবার্গ দম্পতিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যকারী গুপ্তচর বলে মার্কা দিয়ে প্রাণদণ্ডের নামে হত্যা করেছিল।

ইরাক আক্রমণের অজুহাত হিসাবে যতই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধুয়া তোলা হোক না কেন, সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসির ঘটনার মধ্য দিয়ে বর্বর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস হত্যাকারীর চেহারাটা আরও একবার লোকসমক্ষে এল। এর দ্বারা মার্কিন দখলদাররা যেমন ইরাকের সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করল, তেমনই কৌশলে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় দু'টির মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চালাল।

ইরাকের মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল না হতে পারে, যাতে তারা সম্প্রদায়গত শত্রুতার বিষে জর্জরিত হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি করে — সেই চক্রান্ত চালিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। যেমন করে ব্রিটিশরা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়েছিল 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি'তে। সাদ্দাম হুসেন যেহেতু সুন্নি সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই তাঁর ফাঁসির আদেশ দেওয়া থেকে শুরু করে তা কার্যকর করার যাবতীয় কার্যকলাপ তারা বেছে বেছে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের দিয়ে করিয়েছে, যাতে করে সাদ্দাম হত্যার সমস্ত দায়, ইরাকের সমস্ত শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ওপর পড়ে এবং সেদেশে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এ সমস্ত কিছুই করানো হয়েছে ইরাকের সরকারের আদেশ অনুযায়ী। অথচ এ'কথা আজ বিশ্বের সকলেরই জানা যে, মার্কিন শাসকদের অনুমতি ব্যতিরেকে ইরাকের সেই পুতুল সরকারের একটি পা-ও ফেলার উপায় নেই।

যে নৃশংস বর্বরতায় সাদ্দাম হুসেনকে হত্যা করা হ'ল, তা দেখে গোটা বিশ্বের মানুষ শিউরে উঠেছে, তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে দিকে দিকে। সমালোচনার হাত থেকে বাঁচতে মার্কিন পুঁজিপতিশ্রেণীর পেটোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি অনবরত প্রচার করে চলেছে যে, এ হ'ল ইরাকী ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত, এর সঙ্গে মার্কিন দখলদার বাহিনী বা মার্কিন প্রশাসনের কোনও সম্পর্ক নেই।

কিন্তু বাস্তব সত্য হ'ল এই যে, সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে কলকাঠি নেড়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মার্কিন দখলদার বাহিনীই সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এই ট্রাইব্যুনালটি সৃষ্টি করেছে। সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন লঙ্ঘন করে তৈরি হয়েছে এই বিশেষ আদালত। মার্কিন দখলদার বাহিনী এই আদালতের সমস্ত বিচারক ও কর্মচারীদের নিয়োগ করার কর্তা। এর খরচও যোগায় মার্কিন কংগ্রেস। এখানকার আইনগুলি তৈরি করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরামর্শদাতা গোষ্ঠী।

যাঁরা সাদ্দাম হুসেনের মৃত্যুদণ্ডের পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলি নির্দেশকে অস্বীকার করতে চাইছেন, যাঁরা বলছেন, এ ইরাকী আদালতের সিদ্ধান্ত, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, মার্কিন দখলদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার সময় থেকে শুরু করে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সাদ্দাম হুসেন মার্কিন সামরিক বাহিনীর হাতেই বন্দী ছিলেন। তাঁকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেটি ছিল একটি মার্কিন সেনা ক্যাম্প। ফাঁসির মঞ্চ তৈরি হয়েছিল 'ভিক্‌ট্রি' নামে আরেকটি মার্কিন সেনা ক্যাম্পে এবং মার্কিন সেনাদের কড়া পাহারায় মার্কিন হেলিকপ্টারেই সাদ্দাম হুসেনকে সেখানে আনা হয়। এরপর ফাঁসি দেওয়ার কাজটি সমাধা করার জন্য ও সেই ঘটনার সাক্ষী থাকার জন্য কয়েকজন বাছাই করা ইরাকীকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেখানে।

মার্কিন বাহিনীর ইরাক আক্রমণের সঙ্গে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা না করার বিন্দুমাত্র সংস্রব নেই। সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরারা এ আক্রমণ চালিয়েছে ইরাক দখল করে সেখানকার তেলের ভাণ্ডার লুঠ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সাদ্দাম হুসেনের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাতে ইরাক আক্রমণ — মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এ'কথা বলা সাজে না। পৃথিবীর ইতিহাসের বহু কুখ্যাত স্বৈরাচারীর সঙ্গে বহুবার গাঁটছড়া বেঁধে, মদত দিয়ে মার্কিন একচেটে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ইরানের শাহ্, কঙ্গোর মোবুতু, চিলির পিনোচেট, ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো — ইত্যাদি বহু বর্বর স্বৈরাচারীকে তারা অর্থ সরবরাহ করেছে, অস্ত্র জুগিয়েছে। আজও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতেই পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইজিপ্ট কিংবা কুয়েতে অবাধে স্বৈরাচারী শাসন চলছে। এমনকী স্বয়ং সাদ্দাম হুসেনের সঙ্গেও ১৯৮০ সালে জোট বাঁধতে চেয়েছিল মার্কিন সরকার। সেইসময় ইরানের মার্কিনবিরোধীদের দমন করতে, ইরাকের সাহায্যের দরকার পড়েছিল তাদের। হেনরি কিসিংগারের লেখা থেকে জানা যায় যে, ইরান ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে আসলে তারা দু'টি দেশকেই দুর্বল করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

ইরাকের সার্বভৌমত্ব তথা সে দেশের তেলের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের দখল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়াই হ'ল সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে সাদ্দাম হুসেনের 'অপরাধ'। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই প্রাণদণ্ডের নামে হত্যা করা হ'ল সাদ্দাম হুসেনকে।

ইরাক থেকে মার্কিন সৈন্য ফিরিয়ে আনার দাবিতে ২৭ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে বিশাল বিক্ষোভ

১৯৫৮ সালে ইরাকের তৈলক্ষেত্রগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। ইরাক গড়ে উঠেছিল একটি আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সেখানে বিনামূল্যে পাওয়া যেত এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানও ছিল ঐ অঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত।

সাদ্দাম হুসেনের আমলে ইরাকবাসীরা কেমন ছিলেন, আর এখনই বা তাঁরা কেমন আছেন, এই বিষয়ে সম্প্রতি 'ইরাক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ' ইরাকীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, প্রায় ৯০ শতাংশ ইরাকবাসী জানিয়েছেন, তাঁরা সাদ্দাম হুসেনের শাসনকালেই অনেক ভাল ছিলেন।

সেই স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ দেশটির ওপর জঘন্য হামলা চালিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আসলে ইরাকের সমৃদ্ধ তেলের খনিগুলির দখল নেওয়াই ছিল মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য। মার্কিন শাসকশ্রেণীর এই লক্ষ্যে সামিল হয়েছে সেখানকার পেটোয়া প্রচারমাধ্যম, কংগ্রেসের উভয় কক্ষ, রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট — সমস্ত রাজনৈতিক দলই।

এর আগে ১৯৯১ সালে যখন ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে ইরাকের বিভিন্ন শহর, কলকারখানা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন, তখন এরা কেউই আপত্তি করেনি। ২০০৩-এর ইরাক আক্রমণের ঘটনাকেও এরা সমর্থন করেছে। এর কারণ, এদের সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া গোষ্ঠীর মুনাফার স্বার্থে ইরাকের তৈলক্ষেত্রের উপর অধিকার কায়েম করা। ইতিমধ্যেই 'ইরাক স্টাডি গ্রুপ'-এর এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, মার্কিন প্রশাসন ইরাকী সরকারকে দিয়ে খুব শীগ্‌গির একটি নতুন 'পেট্রোলিয়াম আইন' পাস করিয়ে নিতে চলেছে। বিস্তৃতভাবে জানা না গেলেও এ'কথা জানা গেছে যে, এই আইনের মদতে বিদেশি কর্পোরেশনগুলি ইরাকের তেলভাণ্ডার থেকে অবাধে তেল উত্তোলন ও বিক্রি করার অধিকার লাভ করবে, স্বভাবতই এর দ্বারা তারা বিপুল মুনাফা লুটবে। বলাবাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির স্বার্থে এই আইনটির খসড়াটি পর্যন্ত তৈরি করে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।

ইরাককে পদানত করার জন্য ক্রিমিনাল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অসংখ্য যুদ্ধাপরাধ ঘটিয়েছে। ইরাকের জনগণের উপর আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ অস্ত্র তারা অক্লেশে ব্যবহার করেছে। ইরাকী শহরগুলিকে তারা 'বাঙ্কার বাস্টার', 'ক্লাস্টার বোমা', 'নাপাম বোমা' এমনকী 'ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম' দিয়ে তৈরি বোমা মেরে ধ্বংস করেছে। ১৩ বছর ধরে অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে শিশু-বৃদ্ধ সহ ১৫ লক্ষ ইরাকী নাগরিককে অপুষ্টি ও অসুস্থতাজনিত কারণে তিলে তিলে হত্যা করেছে। ২০০৩-এ আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে মার্কিন দখলদার বাহিনীর হাতে কত মানুষের যে মৃত্যু হয়েছে, তার প্রকৃত কোনও হিসাব নেই। নিরস্ত্র ও প্রতিরোধে অক্ষম নিরীহ ইরাকী নাগরিকদের ওপর আবু ঘ্রাইবের মতো কয়েদখানায় তারা কী অমানুষিক বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে তার চিত্র বিশ্ববাসী দেখেছে। নৃশংসতা ও বিকৃতির দিক থেকে তা অনেক ক্ষেত্রে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এক হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে, গত ৪ বছরের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সাড়ে ছয় লক্ষ ইরাকীকে হত্যা করেছে, ২০ লক্ষ মানুষকে দেশছাড়া করেছে। শুধু এই নয়, ইরাক পুনর্গঠনের নামে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, হাজার হাজার দুর্নীতিপরায়ণ মার্কিন কন্ট্রাক্টররা সে অর্থের বিপুল অংশ লুটেপুটে খেয়েছে।

এর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক ইরাকী মানুষ অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে লাগাতারভাবে যে অসাধারণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তার সামনে চূড়ান্ত আধুনিক ও ক্ষমতাশালী অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পিছু হঠতে হয়েছে। ইরাকে যুদ্ধরত মার্কিন সেনাদের একটি বড় অংশ এই যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি জর্জ বুশকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে যে, ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। গোটা বিশ্বজুড়ে মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠেছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ আজ রুখে দাঁড়িয়েছে এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

কৃতকর্মের ফলেই মার্কিন প্রশাসন ও তার সর্দার জর্জ বুশ আজ রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। কিন্তু নির্লজ্জ নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ তার দখলদারি ছাড়তে রাজি নয়। তাই নতুন 'পেট্রোলিয়াম আইন' পাশ করিয়ে ইরাকের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত তারা শুষে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের এই নগ্ন নৃশংসতা ও সর্বগ্রাসী লোভের বিরুদ্ধে শুধু ইরাকের মাটিতে নয়, গোটা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে গড়ে তুলতে হবে সংগঠিত ও লাগাতার শক্তিশালী জঙ্গি শান্তি আন্দোলন।

অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

বিশ্বায়নের ধ্বংসাত্মক নীতি পাল্টাতে হবে

গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৬ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আসন্ন বাজেট সম্পর্কে আলোচনার জন্য সারা দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইউ টি ইউ সি-এল এসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা। এই মিটিং-এ কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন—

''আমরা আপনাদের কাছে ইতিমধ্যেই সকলের স্বাক্ষরিত যে স্মারকলিপি পেশ করেছি, তাতে দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কতগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবির কথা বলা হয়েছে, যেগুলির আশু সমাধান প্রয়োজন। আমার মনে হয় না এখানে সেগুলিকে নিয়ে আবার বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে। আমরা আশা রাখি, আপনারা সেগুলিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন এবং বাজেট তৈরির সময়ও এগুলির কথা মাথায় রাখবেন। এখানে আমি সরকারের নীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করতে চাই। সরকার বর্তমানে যে নীতি নিয়ে চলছে, তার ফলে জনজীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, বা এখনও হয়ে চলেছে। মাত্র দশ মিনিট সময়ের মধ্যে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যে কত কঠিন তা নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই অনুধাবন করতে পারছেন। সারাদিন ধরে আলোচনা চললেও হয়তো বা বিষয়টি শেষ নাও হতে পারত। তা সত্ত্বেও আমি এই নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরতে চাইছি।

এককথায় সরকারের এই নীতি বাস্তবে বিশ্বায়নেরই নীতি। আপনারা সবাই জানেন যে, এই বিশ্বায়নের লক্ষ্যই হল, দেশি-বিদেশি বেসরকারি পুঁজির স্বার্থে সুবিধা আদায়ের কাজে সরকারগুলিকে ব্যবহার করা, যাতে মুনাফা লোটা সহজসাধ্য হয়। এই কথা শুধু আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই নয়, সকল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের ক্ষেত্রেই সত্য। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই নয়, সমস্ত রাজ্য সরকারও এই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। আপনারা তো জানেন, কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুরে গরিব ও মধ্যচাষীদের এবং ওড়িশার কলিঙ্গনগরে গরিব আদিবাসীদের জমি জোর করে কেড়ে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সরকার বর্তমানে টাটাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ঠিক একইভাবে উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে উত্তরপ্রদেশ সরকার জোর করে চাষীদের জমি কেড়ে নিয়ে তুলে দিয়েছে আম্বানিদের হাতে। হরিয়ানার ঝাঝরেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু গণআন্দোলন গড়ে তুলে আমরা তা প্রতিরোধ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই টেলিকমে ৭৫ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আহ্বান করেছে। বিমাক্ষেত্র এবং বিমান পরিবহন ক্ষেত্রেও এর পরিমাণ ৪৯ শতাংশ। এছাড়া খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রও শীঘ্রই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সামনে খুলে দেওয়া হতে চলেছে।

এ'কথা তো সবাই জানে যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাস্তবে জঙ্গলের আইনই চলে। এখানে সর্বদাই বড় ছোটকে গিলে খায়, যার জোর বেশি সে কমজোরিকে গ্রাস করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রায় নিশ্চিত যে, একমাত্র মুদির দোকান ছাড়া (যেহেতু একমাত্র মুদির দোকানকেই এই বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়েছে) ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা যে সমস্ত ব্যবসা চালান, তার প্রায় সবকিছুই এখন এক এক করে চলে যাবে শক্তিশালী বহুজাতিক কোম্পানির গ্রাসে। এর ফল হবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁরা আজ ছোট ছোট দোকান চালান এবং মনোহারি, বৈদ্যুতিক বা ক্রীড়াসামগ্রীর ব্যবসা করেন, তাঁরা তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়বেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পক্ষে দেশি-বিদেশি বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় এঁটেওঠা সম্ভব হবে না। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এইভাবে জীবিকাচ্যুত হবেন। এছাড়া আপনারা এও জানেন যে, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের ফলে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে বেশ কয়েক লক্ষ ছোট ও মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এই সব কারখানার শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই বেকার হয়েছেন। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারি ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারি দপ্তরে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। শুধুমাত্র ব্যাঙ্কশিল্পেই ১৩ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ৯ লক্ষকেই ছেঁটে ফেলা হবে বলে ঠিক হয়ে গেছে। এরজন্য শুধু স্বেচ্ছাবসর প্রকল্পই নয় বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্পেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। রেল, বিমাক্ষেত্র সর্বত্রই চিত্রটা একই। অবশ্য উদারীকরণের বিষয়টি নিয়ে আরও অগ্রসর হলে চাকরির ধারণাটাই বদলে যাবে। সেটাও যথেষ্ট বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ সেক্ষেত্রে স্থায়ী চাকরি বলে আর কিছুই থাকবে না। স্কেল অফ পে বা অবসরকালীন সুযোগসুবিধাও একরকম উঠেই যাবে।

শুধু বেসরকারি ক্ষেত্রে নয়, এমনকী সরকারি ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সমস্ত চাকরিই হয়ে দাঁড়াবে সাময়িক ও চুক্তিভিত্তিক — তিন বছর, চার বছর বা পাঁচ বছরের জন্য। এর বিনিময়ে কর্মচারীরা একটি নির্দিষ্ট টাকা পাবেন, কিন্তু দিনে তাঁদের ১০ ঘন্টা, ১২ ঘন্টা, এমনকী ১৪ ঘন্টাও কাজ করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সামান্য কিছু কর্মচারী প্রচুর মাইনে পাবেন। কিন্তু বাকিরা, বিশেষত যাঁরা নানা কলসেন্টার বা বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং-এ কাজ করবেন, তাঁদের খুবই কম মাইনের বিনিময়ে দিনে ১২-১৩ ঘন্টা ডিউটি করতে হবে। এমনকী রাতেও তাঁদের অনেকসময়ই কাজ করতে হবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের কাজে তাঁদের স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। এই কারণে দেখা গেছে, ইতিমধ্যেই এই কাজে নিযুক্ত বহু কর্মচারী মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাস্তব সত্য হ'ল — এই নীতি দেশের শ্রমজীবী মানুষকে পুনরায় ১৮৮৬ সালের আগের অবস্থায় ঠেলে ফিরিয়ে দেবে — সেই যখন দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে আমেরিকার শ্রমিকরা শিকাগো শহরের হে মার্কেটে লড়াই করেছিলেন।

আপনারা আরও জানেন যে, বিশ্বায়নের আরেকটি লক্ষ্য হ'ল, সাধারণ মানুষের প্রতি দেশের সরকারের যেসব দায়দায়িত্ব থাকে, সেগুলি ঝেড়ে ফেলতে সরকারকে সুযোগ করে দেওয়া। অর্থাৎ এর ফলে সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সরকারের আর কোনও দায়দায়িত্ব থাকবে না। কেউ যদি শিক্ষা বা চিকিৎসা পেতে চায়, তবে বাজার থেকে তাকে তা কিনতে হবে। শিক্ষার এই বাণিজ্যিকীকরণের কাজ আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আর গ্যাটস চুক্তি পুরোপুরি রূপায়িত হলে শিক্ষা হয়ে দাঁড়াবে সোজাসুজি একটি পণ্য। চাকরি-বাকরি বা জীবিকার ব্যাপারেও সরকার আর কোনও দায়িত্ব নেবে না। স্বাস্থ্য বা বাসস্থানের ব্যাপারেও বিষয়টি একই দাঁড়াবে। মানুষকে ঐসবই বাজার থেকে কিনতে হবে।

উদারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের এই নীতি রূপায়ণের ফলে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা কী দাঁড়াবে? এই কয়েকদিন আগেই সংবাদপত্রে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশনের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ ভারতের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ মানুষের আয় দিনে মাত্র ১২ টাকা। এখানে মনে রাখতে হবে, এই এক-তৃতীয়াংশ মানে প্রায় ২০ কোটি মানুষ। শহরের জনসংখ্যারও প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষের আয় দেখা যাচ্ছে দিনে মাত্র ১৯ টাকা। ১০ শতাংশ মানুষ যাঁরা শহরে বাস করেন, দৈনিক ১৩ টাকা খরচের ক্ষমতাও তাঁদের নেই। এই ছবিটাও কিন্তু আজকের দেশের প্রকৃত অবস্থাটা তুলে ধরছে না। এই রিপোর্টটি ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরের এবং এটি একটি স্যাম্পল সার্ভে মাত্র। এর মধ্যে অবস্থা আরও খারাপই হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এই রিপোর্টটিকেও দেশের প্রকৃত চিত্রের একটা প্রতিফলন হিসাবে ধরে নিই, তাহলে দেশের আসল অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? তাছাড়া এ কথা তো সবাই জানে, বেসরকারীকরণ, উদারীকরণের ফলে বেকার সমস্যা এখন কী হারে বাড়ছে। অথচ সরকার দাবি করছে যে, আমাদের আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার এখন অত্যন্ত বেশি। প্রায় ৮-৯ শতাংশ। কিন্তু এই উন্নয়ন কাদের? মাত্র কয়েকটি করপোরেট হাউসের। আর এদের উন্নয়নের বলি হতে হচ্ছে কোটি কোটি শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে। তথ্যপ্রযুক্তি ও গাড়ি তৈরির শিল্প কিছু তৈরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বায়নের নীতি রূপায়ণ শুরু হওয়ার পর থেকে বুনিয়াদি ও মৌলিক শিল্পের কোনও বিকাশ ঘটেনি। এইসব কিছুই যথেষ্ট পরিষ্কারভাবেই ইঙ্গিত দেয় যে, বিশ্বায়নের নীতির ফলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সব দিক থেকেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সর্বনাশ হতে চলেছে। বেশিরভাগ দলই বলছে, আজকের দুনিয়ায় বিশ্বায়ন ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, ফলে আমাদের ঐ পথেই চলতে হবে। কিন্তু কেন? যদি কিউবা, উত্তর কোরিয়া বা লাতিন আমেরিকার আরও কয়েকটি দেশ অন্য পথে চলতে পারে, তবে আমরাই বা পারব না কেন? ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি ঐসব দেশগুলির চেয়ে অনেক বেশি। আর যদি ভারতবর্ষ এই বিশ্বায়নের পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসে তবে এটা একরকম নিশ্চিত যে, ছোট ছোট আরও অনেক দেশ, যারা বিশ্বায়নের জাঁতাকলে পড়ে আরও অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারাও এর থেকে বেরিয়ে আসার সাহস পাবে। আপনারা যদি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের পাশে সত্যি সত্যি দাঁড়াতে চান, তাহলে আপনাদের প্রতি অনুরোধ এই যে, সমগ্র নীতিটিকেই পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখা হোক।''

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর পরে ইউ টি ইউ সি-এল এসের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা তাঁর বক্তব্যে বলেন, গোটা দেশের মানুষ স্বাধীনতার পর থেকেই দাবি করে আসছেন যে, কাজের অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে নিতে হবে। দ্বিতীয় শ্রম কমিশনও তার প্রস্তাবে একই কথা বলেছে। দ্বিতীয়ত তিনি দাবি জানান, এমনভাবেই বাজেট তৈরি করতে হবে যার ফলে নতুন নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া বেকারদের উপযুক্ত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাও তাতে রাখতে হবে বলে দাবি জানান তিনি। তিনি আরও দাবি জানান যে, ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সের পর্যালোচনাগুলিকে ভিত্তি করে ন্যূনতম মজুরির হার নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে। এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালতের মতও যে তাই, তা তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি আরও জানান যে, সর্বোচ্চ আদালতও লক্ষ করেছে যে, বহুক্ষেত্রেই শ্রমিকরা নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন। এই ধরনের শ্রমকে সর্বোচ্চ আদালতের মতে ফোর্সড লেবার হিসাবেই গণ্য করা উচিত। এই মত অনুযায়ী দেশের ৯২ শতাংশ শ্রমিকই ফোর্সড লেবার দিতে বাধ্য হন। এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচিত হওয়া উচিত।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার আড়ষা থানার প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড জলধর মাঝি গত ২ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। আড়ষা থানায় পার্টির সূচনাতেই যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কমরেড জলধর মাঝি ছিলেন অন্যতম। দরিদ্র খেতমজুর পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দলের কাজে তিনি সর্বদা নিযুক্ত থাকতেন এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তিনি তাঁর পরিবারকেও দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। তথাকথিত বড় দলগুলি তাঁর প্রচণ্ড দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাঁর বিবেককে মারতে চাইলেও তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ নিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। কমরেড জলধর মাঝির মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড জলধর মাঝি লাল সেলাম

ফুলবাড়িতে

বিদ্যুৎগ্রাহকদের আন্দোলনের জয়

শিলিগুড়ির অদূরে ২নং ফুলবাড়ি অঞ্চলের ছোবাভিটা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুতের খুঁটির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে অ্যাবেকা। বিভিন্ন জায়গায় মিছিল, সভা, কমিটি গঠন শুরু হয়। এরপর জেলাশাসক, বিদ্যুৎ অফিস, অঞ্চলপ্রধান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ বিভিন্ন মহলে দরবার শুরু হয়। আন্দোলন চলাকালীন এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ উক্ত এলাকায় হাই-টেনশন লাইন পাতার কাজ বন্ধ করে দাবি তোলেন, সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না করে হাই-টেনশন লাইন টানা চলবে না। তাছাড়া কংগ্রেস পঞ্চায়েত প্রধান নিজের ইচ্ছা মতো বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতার কাজ শুরু করলে এলাকাবাসীরা সেটা বন্ধ করে দেন। এতে প্রধান ক্ষিপ্ত হয়ে ভক্তিনগর থানায় আন্দোলনকারী কয়েকজনের নামে এফআইআর করেন। তাতেও আন্দোলন দমন করতে না পেরে গত ১৯ জানুয়ারি চার ভ্যান পুলিশ নিয়ে যান। এলাকায় জলপাইগুড়ির ডিএম, পদস্থ পুলিশ অফিসার, ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত হলে জনতা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবং যে ম্যাপ অনুযায়ী টাকা বরাদ্দ করা হয় সেই ম্যাপের কপি দেখতে চায়। আন্দোলনের চাপে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার ম্যাপের কপি দেখাতে বাধ্য হন এবং সেই ম্যাপে প্রচুর গরমিল দেখা যায়। ইঞ্জিনিয়ার তা স্বীকার করেন। শেষপর্যন্ত ঐ এলাকায় ৩টি খুঁটির পরিবর্তে ১০টি খুঁটি দেওয়া হবে বলে উচ্চপদস্থ পদাধিকারীরা প্রতিশ্রুতি দেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জ্যোৎস্না রায়, মোজাম্মেল হক, রামকৃষ্ণ দাস, দিলীপ রায় প্রমুখ। দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলন গড়ে তুলে শেষ পর্যন্ত দাবি আদায় হওয়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান অ্যাবেকার দার্জিলিং জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল। এদিকে মংপুতে বসতবাড়ির উপর দিয়ে হাই-টেনশন লাইন নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি মংপু শাখার পক্ষ থেকে ব্যাপক সই সংগ্রহ ও সভা করা শুরু হয়েছে।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

ধর্মঘটী জুট শ্রমিকরা শ্রম আইন লঙঘনকারী মালিকদের শাস্তির দাবি জানাল

প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই এবং গ্র্যাচুইটির টাকা না দেওয়ার অপরাধে মালিকপক্ষকে শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাল বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। ২৫ জানুয়ারি সহস্রাধিক জুট শ্রমিক হুগলির চুঁচুড়ায় অতিরিক্ত জেলাশাসককে ৬ দফা দাবিপত্র পেশ করে জানিয়েছে, চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও মালিকপক্ষ ২০০৫ সালের নভেম্বর থেকে তাদের মহার্ঘভাতা দিচ্ছে না। একইভাবে গ্র্যাচুইটি বাবদ ৩৫০ কোটি টাকা, পি এফের ৩০০ কোটি টাকা এবং ইএসআই-এর ১০০ কোটি টাকা মালিকরা দিতে টালবাহানা করছে। এই চূড়ান্ত বঞ্চনা এবং শ্রমিকদের দাবির প্রতি ঔদাসীন্যই রাজ্যের আড়াই লক্ষ জুট শ্রমিককে ধর্মঘটের পথে ঠেলে দিয়েছে। ৫ জানুয়ারি থেকে এই ধর্মঘট চললেও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দেওয়ার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করছে না। অথচ কোন অন্যায় আবদার বা দাবি শ্রমিকরা করেনি। শ্রম আইন অনুযায়ী যা যা তাদের প্রাপ্য শ্রমিকরা শুধু সেটাই দাবি করেছে। মালিকপক্ষ শ্রম আইন মানছে না। সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ। শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে মালিকদের বাধ্য করতে সরকার কোন কথাই বলছে না। বরং দেখা যাচ্ছে, সরকার যেন মালিকপক্ষের মুখপাত্র হিসাবেই কাজ করছে এবং পুলিশ দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে ধর্মঘট ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে। সরকারের এই ভূমিকা শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমআইন লঙঘন করার জন্য ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন মালিকদের শাস্তির দাবি তুলে জেলা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। ডিএম অফিসের সামনে শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য সহ কমরেডস বিমল জানা, লিলি পাল, কাশীনাথ বসাক, মিলন রক্ষিত, অযোধ্যালাল মাহাতো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এদিকে গ্যাঞ্জেস জুটমিলের চার হাজার শ্রমিক ৫ নভেম্বর ২০০৬ থেকে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক পরিবারে খাওয়াপরার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তবুও মালিকরা শ্রমিকদের দাবি মানছে না। এদিকে 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প ভবিষ্যৎ' বলে সরকার সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে কৃষকের জমি দখল করতে মরিয়া। রাজ্যের অসংখ্য কর্মহীন মানুষের সামনে বিপুল কর্মসংস্থানের টোপ ঝুলিয়ে তারা বড় বড় কথা বলছে, অথচ জুটমিলগুলির মালিকদের শ্রমআইন মানতে বাধ্য করছে না এবং বন্ধ কারখানা খুলে শ্রমিকদের কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার সদিচ্ছাটুকু পর্যন্ত দেখাচ্ছে না। আসলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পে শ্রমিকদের সামনে সোনালী ভবিষ্যৎ দূরস্থান, তাদের অস্তিত্বই যে বিপন্ন, চটকল ধর্মঘট সেদিকটিও দেখিয়ে দিচ্ছে।

ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে শিল্পায়ন সম্ভব নয়

শিলিগুড়ির জনসভায় কমরেড গোপাল কুণ্ডু

শিল্পায়নের নামে কৃষিজমি জবরদখলের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই ফুলবাড়ি লোকাল কমিটির ডাকে ২৪ জানুয়ারি ফুলবাড়ি হাটে এবং শিলিগুড়ি লোকাল কমিটির ডাকে ২৫ জানুয়ারি শহীদ তন্ময় মুখার্জী চকে (কোর্ট মোড়ে) জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি সভাতেই প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। এছাড়াও ফুলবাড়ি হাটের সভায় বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, দলের কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস-এর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক এবং ফুলবাড়ি লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড আবুল কাসেম। ২৫ জানুয়ারি তন্ময় মুখার্জী চকের সভায় কমরেড গোপাল কুণ্ডু ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য ও নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজিত রায়।

কমরেড গোপাল কুণ্ডু বলেন, রাজ্য সরকার শিল্পায়নের স্লোগান দিলেও এই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে তা সম্ভব নয়। বড়জোর একটা-দু'টো কল-কারখানা হতে পারে। একদিকে একটা-দুটো হবে, অন্যদিকে শত শত শিল্প বন্ধ হবে। সিপিএম আজ মার্কসবাদ থেকে, বামপন্থী আদর্শ থেকে বিচ্যুত বলেই শিল্পায়নের ভাঁওতা দিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থে কৃষিজমি কেড়ে নিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসও আজ আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি নয়। এরা কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরোধী নয়। অন্য রাজ্যে কংগ্রেস জমি অধিগ্রহণ করছে। পরিষদীয় রাজনীতির দিকে তাকিয়েই এরাজ্যে এদের বিরোধিতা। ঠিক যেমন সিপিএম অন্য রাজ্যে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করছে আর এ রাজ্যে অধিগ্রহণের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তাই সিপিএম-এর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে সঠিক নেতৃত্ব চিনে আন্দোলনকে দৃঢ়ভিত্তির উপর গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

২২ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি শহরে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু

রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ অবরোধ

অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ১৮ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ঐদিন অ্যাবেকার ডাকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জাতীয় সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

(১) কৃষিবিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার অথবা ভর্তুকি প্রদান, (২) কৃষিতে ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ, (৩) কৃষি- বিদ্যুতের কেটে দেওয়া লাইন অবিলম্বে জুড়ে দেওয়া, (৪) লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ অবিলম্বে বন্ধ করা অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়া, (৫) ক্ষুদ্র শিল্প ও গৃহস্থকে ১ টাকা দরে বিদ্যুৎ দেওয়া, (৬) চুরি প্রমাণ না করে গ্রাহকদের লাইন কাটা ও জরিমানা আদায় বন্ধ করা, (৭) লাইসেন্সির অফিসারের পরিবর্তে নিরপেক্ষ অফিসারকে 'অ্যাপিলেট অথরিটি' নিয়োগ করা, (৮) গড় মাসিক বিলের বেশি সিকিউরিটি আদায় বন্ধ করা, ইত্যাদি দাবিতে গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখান। পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদা, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ও হরিহরপাড়ায়, নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ৩৪নং জাতীয় সড়কে, উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত ও হাবড়ায়, বর্ধমানের কার্জন গেটে, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে, কুচবিহার সদর, হুগলির মগরায় জিটি রোডে, বীরভূমের সিউড়ি কোর্টের সামনে পথ অবরোধ হয়। এছাড়া বাঁকুড়ার মাচানতলায় ও পুরুলিয়ায় কোর্টের সামনে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কলকাতায় সিইএসসি'র সদর দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে বিক্ষোভ সভা ও মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

ইউটিইউসি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে হকার উচ্ছেদ প্রতিরোধ

দীর্ঘ ২১ বছর ধরে বর্ধমান রেলওয়ে ওভারব্রীজের পার্শ্বস্থ জমিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত জনপ্রিয় হকার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ১০০ জন হকার ব্যবসা করে রুটি-রুজির সংস্থান করে আসছিল। হঠাৎ গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখ রাজ্য পুলিশ, রেল পুলিশ এবং রেলের অধিকর্তারা ঐ হকার স্টলগুলি ভেঙে দিতে উদ্যত হন। সমবেতভাবে হকাররা এবং তাঁদের পরিবারের সমস্ত মানুষ সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধে সামিল হন এবং বলেন যে, এই জমি রেলের নয়, সুতরাং রেলের উচ্ছেদ করার কোন এক্তিয়ার নেই। ১৯৮১ সালে তৎকালীন জেলাশাসক জহর সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে চৌধুরী বাজারের হকারদের পূর্ত বিভাগের এই জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে ঐদিন রেল কর্তৃপক্ষ গণবিক্ষোভের মুখে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

এরপর গত ২২ জানুয়ারি প্রায় চার শতাধিক হকারের এক মিছিল বর্ধমান জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভে সামিল হয়। এই জমিতে রেলের যে কোন অধিকার নেই, সেই সমস্ত প্রমাণ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে যে, জাতীয় হকারনীতি অনুযায়ী 'হকাররা সমাজের বোঝা নয়, সমাজ অর্থনীতির অঙ্গ। সুতরাং হকারদের উচ্ছেদ করা চলবে না।' অতিরিক্ত জেলাশাসক সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন।

জাতীয় হকার নীতিকে উপেক্ষা করে হকার উচ্ছেদ করলে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলে ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড বিধান চ্যাটার্জী জানান। এই দিন অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন কমরেডস্ আলাউদ্দীন সেখ, সুব্রত বিশ্বাস ও সুরজিৎ দাস।

সরকারি অবহেলায় কয়লাখনিতে মৃত্যু

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন ঃ

২২ জানুয়ারি আসানসোল মহকুমার সালানপুরে পরিত্যক্ত কয়লা খাদানে ধসে চাপা পড়ে ৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অতি সম্প্রতি গাঙটিকুলিতে পরিত্যক্ত খাদানে জল ঢুকে বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারান। পরের পর এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত ১৬ জানুয়ারি আসানসোলের কালীপাহাড়ির কাছে ছাতাপাথর বস্তিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, যার জেরে ২নং জাতীয় সড়কে ২০০ মিটার ফাটল ধরেছে এবং পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ লাইন আজ বিপজ্জনক অবস্থায়, যে কোন সময়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অবৈধ খনিগুলি থেকে কয়লা উত্তোলনের ফলে প্রায় প্রতিদিনই খনি দুর্ঘটনায় গরিব মানুষের মৃত্যু ঘটছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় লালিত কয়লা মাফিয়ারা মানুষের অভাবের সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মজুরিতে নিরাপত্তাহীন এই খনিগুলিতে গরিব মানুষকে কয়লা উত্তোলনে বাধ্য করছে। অভাবি মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খনি গহ্বরে কয়লা কাটতে নামে যার ফলে এই দুঃখজনক মৃত্যুগুলি ঘটে চলেছে। দুর্ঘটনার কিছু সংবাদ প্রকাশ পায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাপা পড়ে থাকে। কয়লা মাফিয়া, পুলিশ-প্রশাসন এবং শাসক রাজনৈতিক দলের টাকার লালসা মানুষের প্রাণ এবং সম্পদকে কত বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে এসেছে, এই ঘটনাগুলি বারেবারেই তা প্রমাণ করছে। আমরা দাবি করছি ঃ ১) খনি ধসে চাপা পড়ে মৃত ৭ জনের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ২) উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ও বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের দ্বারা তদন্ত করে খনি ধস বন্ধ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করতে হবে, ৩) অবিলম্বে মাফিয়ারাজ বন্ধ করতে হবে, ৪) পুলিশ, কয়লা মাফিয়া এবং শাসক রাজনৈতিক দলের নেতাদের মিলিত চক্র বন্ধ করতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, ৫) খনি ধস বন্ধ করতে বালি দিয়ে খনি ভরাট করতে হবে এবং ৬) অবৈধ খনন বন্ধ করে বে-আইনি পরিত্যক্ত খনিগুলি সরকারি পরিচালনাধীনে নিয়ে এসে স্থানীয় বেকার যুবকদের কাজের বন্দোবস্ত করতে হবে।

শিল্পায়নের নামে উর্বর কৃষিজমি দখলের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় সমাবেশ ও

১৫ ফেব্রুয়ারি

মহামিছিল সফল করুন

জমায়েত ঃ হেদুয়া পার্ক, কলকাতা, বেলা ১২টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in